সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ
(২য় খণ্ড)

চেরাগে জান শরীফ

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী

উৎসর্গ

মাওলাউল আলা বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর কন্যা আরাফাকে, যিনি সুরেশ্বরীর নয়নের মণি ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক উচ্চ আসনে যাঁর স্থান। যিনি অধম লেখকের বড় মা, যিনি অধম লেখককে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর পাদুকা মোবারক আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। যিনি চোখের জলে আমাকে বলতেন, 'আমার বাবার (স্বয়ং সুরেশ্বরীর) মুরিদানেরা কেউ আমাকে কাঁদাতে পারে নি। আমার স্বামী পীরে কামেল শাহেনশাহে ওলি শাহ সুফি সাইয়েদ গোলাম মাওলা চিশ্‌তি ওরফে শামপুরী শাহ সাহেবের মুরিদেরাও আমাকে কাঁদাতে পারে নি। কেবলই তুই, জাহাঙ্গীর, আমাকে বার বার কাঁদিয়ে গেলি। আমি তোকে ভালবাসি। সুতরাং আমার মনে হয়, আমার বাবাও তোকে ভালবাসেন।'

শুনেছি এই সুফি জগতে বলতে গেলে একজন মুরিদই তাঁর আপন পীরকে সবচেয়ে বেশি কাঁদিয়েছিলেন। সেই মুরিদের নাম হজরত আমির খসরু এবং তাঁর পীরের নাম মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়া।

পীরের প্রেমে মুরিদ কাঁদে, এটাই আমরা জানি। কিন্তু মুরিদের জন্যও যে পীর কাঁদে এটা কি একটা অবাক করা কথা নয়? সেই প্রাণপ্রিয় পরম শ্রদ্ধেয়া পরম পূজনীয়া বড় মা-র কদম মোবারকে এবং দাদুদের তথা বড় দাদু শাহ সুফি ডা. সাইয়েদ গোলাম মোনায়েম হোসায়নী চিশতি ওরফে শরীফ, মেজ দাদু শাহ সুফি সাইয়েদ গোলাম মোকতাদের হোসায়নী চিশতি ওরফে ফারুক, সেজ দাদু শাহ্ সুফি সাইয়েদ গোলাম মুরছালিন হোসায়নী চিশতি ওরফে আবরার, চতুর্থ দাদু শাহ সুফি সাইয়েদ গোলাম মোছাব্বির হোসায়নী চিশতি ওরফে আস্‌রার (সোনাদাদা)। প্রত্যেক দাদুই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তবে চতুর্থ দাদু, বড় মা আমাকে যে রকম স্নেহ করতেন অনেকটা সে রকম না হলেও কাছাকাছি বলতে চাই। কারণ সোনাদাদুর ফারসি ভাষার উপর যে দখল আছে আমি তার ধারে- কাছেও নাই। তাঁহাদের কদম মোবারকে আমার এই অতি নগণ্য লিখনী উৎসর্গ করে গেলাম।

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোনো দামে বিক্রি অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লিখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোনো প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবেও না। কারণ, এই বইটির মালিকানা লিখক নিজ হইতে সজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো দেশের মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্য যে কোনো ধর্মের অনুসারীদেরকে সমানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তা ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোনো সাময়িকীতে এই বইয়ের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোনো কারো নামে ধারাবাহিকভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোনো প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোনোদিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন, তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্বআদালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আরও উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারিবেন।

সূচি

আমি স্মরণ করি / ৪৩
যারা সাধনায় আগ্রহী তাদের প্রতি অনুরোধ / ৫০
সুফিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন / ৫১
পীরপূজাই আল্লাহ্‌র পূজা : সুফিবাদের সর্বোচ্চ দর্শনটি হজরত আমির খসরুর এই কালামে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে / ৫২
সাহায্যের আবেদন / ৫৩
কোরান অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা / ৫৬
সূরা নজমের অনুবাদ / ৫৮
সূরা তোয়াহা / ৬৫
নফ্‌স ও রুহের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা / ৯০
মাথার জ্ঞান ও সিনার জ্ঞানের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা / ৯৮
পীর কী এবং পীর ধরা কেন প্রয়োজন / ১০৬
অনুষ্ঠান কখনও ধর্ম নহে / ১১০
পরিতৃপ্ত আত্মার জান্নাতলাভ সম্পর্কে আলোচনা / ১১৬
ইমানের ধারক বাহক কারা? / ১১৮
ভক্তি ও ভক্তির প্রকারভেদ / ১২০
বস্তুর বিজ্ঞান ও আত্মার বিজ্ঞানের স্বরূপ / ১২৩
শয়তানের অবস্থান কোথায় এবং কীভাবে? / ১২৫
আত্মপরিচয়ের জন্য সাধনপদ্ধতির স্বরূপ / ১২৯
পবিত্র কোরান-এর সার্বজনীনতার সাক্ষ্য / ১৩৪
মুসলমানদের পতনের মূল কারণ / ১৩৭
আদম ও মানুষের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা / ১৪৬
সুফিবাদের দৃষ্টিতে আমি ও আমার বলার রহস্য / ১৫০
কোরান-এর কিছু আয়াতের অংশবিশেষ যাহা
প্রচলিত অনুবাদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম / ১৫২
ইফতার বিষয়ে কতিপয় হাদিস / ১৬২
সুফিসাধক আল্লামা জামির একটি কালাম-এর ভাবার্থ / ১৬৩
হজরত বাবা আমির খসরু রচিত কালাম-এর ভাবার্থ / ১৬৪
তিনটি কবিতা/শাহ সুফি সাইয়েদ মোহাম্মদ নাঈম / ১৬৫
তিনটি কবিতা/ অধ্যাপক জামাল / ১৬৮
শাহ সুফি লকবপ্রাপ্তদের নামের তালিকা / ১৭৫

আমি স্মরণ করি

এক. আমি সর্বপ্রথমে স্মরণ করছি পরম শ্রদ্ধার সাথে মহানবির আস্‌হাবে সুফ্‌ফার বিখ্যাত একজন মহান সাহাবা হজরত আবু জর গিফারিকে। যিনি নির্বাসনে যাবার পরে বলেছিলেন যে, আমার লাশ (মোবারক) যেন কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি স্পর্শ না করেন। সিরিয়ার গভর্নর হিন্দার পুত্র মুয়াবিয়ার সঙ্গে সূরা বাকারার দুইশত উনিশ নম্বর আয়াতটির ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেবার পর হিন্দার পুত্র মুয়াবিয়া গোপনে হজরত ওসমান গনিকে আবু জর গিফারির বিষয়টি নিয়ে একটি পত্র লেখে। তার কিছুদিন পর হিন্দার ছেলে মুয়াবিয়া আবু জর গিফারিকে খলিফা হজরত ওসমান গনির কাছে পাঠিয়ে দিল। আমার কাছে এই বিষয়টি একটি রাজনৈতিক চালবাজির বস্তা মনে হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, খলিফা হজরত ওসমান গনি হিন্দার ছেলে মুয়াবিয়ার সঙ্গে একমত (?), অতএব আবু জর গিফারিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। অনেক ইসলাম গবেষক এই বিষয়টিকে রাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখা বলে মনে করেন। এই বিষয়টি জানবার পর অধম লেখকের মনে একটি ধাক্কা লাগে। তাই আমি এবং আমার পুত্ররা রাজনীতি তো দূরের কথা, ভোট কেন্দ্রে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। গাছটি যেমন ফলটি তো তেমনই হবে। আবু সুফিয়ান আর হিন্দা নামক গাছে যেমন মুয়াবিয়া নামক অমৃতের (?) ফলটি ধরেছিল : যে মুয়াবিয়া মহানবি এবং চার খলিফার আদর্শটিকে কবর দিয়ে রাজতন্ত্র চালু করল।

আরও একটি বেশি কথা বলতে চাই যে, অধম লিখক হাসতে হাসতে জাহান্নামে যেতে রাজি আছি, তবুও হিন্দার ছেলে মুয়াবিয়াকে সাহাবা মনে করব না এবং বিশেষ করে এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় ইসলাম গবেষক সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী সাহেবের সাথে ঐকমত পোষণ করি। আল্লামা ইকবাল বলেছেন, দিল ওয়া নিগাহ মুসলমা নাহি তো কুছ্‌ভী নাহি তথা অন্তর এবং দৃষ্টিভঙ্গি যার মুসলমান তথা পরিশুদ্ধ নয়, সে তো মুসলমানই নয়। (তবে তাকিয়া গ্রহণ করাটি জায়েজ আছে এবং কেউ যদি মুয়াবিয়াকে সাহাবা মনে করেন তো এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার বলে অবশ্যই মনে করতে চাই)।

দুই. আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ওলিদের ওলি, পীরদের পীর, যিনি বাক্যদান করার সঙ্গে সঙ্গে ফল ফলে যেত, প্রতিদিন যাঁর বত্রিশ মাইল হাঁটার বিস্ময়কর অভ্যাস, যাঁর মাজারের গম্বুজ বাংলাদেশে সবচাইতে উঁচু, যাঁর মাজারে সব সময় মানুষের যাতায়াত, যাঁর প্রধান মুরিদ ও খলিফা তিনজন তিনটি বিস্ময়॥ মনোহরদীর আসাদ নগরের বাবা মোজাফফর মাস্তান, ভৈরবের কালিকা প্রাসাদের সিরাজ মাস্তান, আর কিশোরগঞ্জের শাহ সুফি বাবা আনোয়ার শাহ কলন্দর॥ সেই মাওলাউল আলা, আসরারে খিজির, মুজাররাত বাবা আবু আলি আক্তার শাহ কলন্দরকে (কানদইলার পীর, কুলিয়াচর) যিনি আজানগাছি পীর সাহেবের প্রধান খলিফা। তবে বলে রাখা ভালো যে, আজানগাছি পীর সাহেবের মুরিদদের মধ্যে দুইটি ধারা প্রবহমান : একটি আচার-অনুষ্ঠানপ্রিয় এবং আলুর দম দেওয়া পোলাও খায়, আর অপর দলটির মাঝে আনুষ্ঠানিকতার প্রাধান্য নাই বললেই চলে এবং নামের শেষে কলন্দর থাকে। তবে অবাক হবার কথাটি হলো, এই দুই দলের মধ্যে কোনো ঝগড়াও নাই, সমালোচনাও নাই। তবে উভয় দলের অনুসারীদের প্রশ্ন করলে বলেন যে, যার যার মনমতো চলতে দিন। আমি অধম বাবা শাহ সুফি আনোয়ার শাহ কলন্দরের যোগ্যতম মুরিদ ও খলিফা বাবা হানিফ শাহ সাহেবকে পরম শ্রদ্ধা করি। উনি নামের শেষে কলন্দর লেখেন না এবং নিজেকে আড়াল করে রাখতে ভালোবাসেন। বাংলার সুফিসাধকদের এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য উনার প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রম সত্যিই বিস্ময়কর। হতাশা শব্দটি উনার কাছে অচল। নিজেকে ছোট করে বিলিয়ে দিয়ে তিলে তিলে কোরবানি করবার চেতনায় অগ্রসর হবার যোগ্যতাটি অবাক করে। কী করে এত ধৈর্য ধারণ করতে পারেন, কী করে প্রায় প্রতিটি দরবারে গিয়ে আপনার সুন্দরতম হাস্তিটি একদম ছোট করতে পারেন তারই শিক্ষা অধম লিখক তাঁর নিকট শিখেছি। বয়সে অনেক বড় হতে পারি, কিন্তু ধৈর্য আর ত্যাগের প্রশ্নে তাঁকে আমার শিক্ষাগুরু বললেও খুব বেশি বলা হবে না। সামান্য মোবাইল ফোনে ডাক দিলে হাসি মুখে যিনি এসে পড়েন, যা দেখতে পাই তাযকেরাতুল আউলিয়া-র মাঝে। বিখ্যাত ওলি হজরত আবু বকর ওয়াস্তির কথা মনে পড়ে। বাবা ওয়াস্তির কাছে এসে অন্য ধর্মের বহু মানুষ মুরিদ হয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুফিবাদের ঝাণ্ডাটি বাংলার বুকে তুলে ধরার সাধনাটি সার্থক হোক। মাওলা তাঁর এই সাধনা ও পরিশ্রমটির সাথে থাকুন, এই কামনা করছি। আর সেই সাথে রইল অধমের আন্তরিক দোয়া।

তিন. আমি স্মরণ করছি নবীনগর উপজেলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত দূবাচাইল গ্রামের পীরে কামেল শাহ সুফি মোখলেছ বাবাজানকে। উনি বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বিখ্যাত মজ্জুব পীর বাবা রাহাত আলীর একনিষ্ঠ ভক্ত এবং উনারই গুরুভাই পীরে কামেল বাবা গনি শাহ। বাবা মোখলেছ শাহের একমাত্র যোগ্যপুত্র ফিজিক্স-এর অধ্যাপক সানু বাবা আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। আমিও পুত্রস্নেহে সুফিবাদের অনেক কিছু তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করি। দুইবার গিয়েছিলাম শ্রাবণের ওরসে। দু'বারেই আমাকে ভক্তদের মজলিশে কিছু বলতে হয়েছিল এবং বেশ কিছুক্ষণ বলার পর ক্লান্ত হয়ে যাই এবং গরমে কাপড় ঘামে ভিজে যায়। মনে মনে একটা ফানটা পান করতে চেয়েছিলাম। মজলিশ থেকে পায়ে হেঁটে যখন সানুদের বাসায় আসলাম, প্রায় নব্বই বছরের বৃদ্ধ বাবা মোখলেছ শাহ একটি গেঞ্জি পরে আসনে বসে আছেন আর ভক্তরা বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হুজুরের ঘরে প্রবেশ করার পর অন্য একটি আসনে আমাকে বসতে দিলেন এবং মুচকি হাসি হাসলেন। একজন ভক্তকে ডেকে কানের কাছে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। একটু পরেই দেখলাম, সেই ভক্ত দুটো ফানটার বোতল এনে হুজুরকে দিলেন। হুজুর আমার হাতে একটি ফানটার বোতল দিয়ে বললেন, উনার ফানটা খেতে মন চেয়েছে। তাই একটা আমি খাই, আর একটা আপনি খান। একদম প্রচারবিমুখ এই নব্বই বছরের বৃদ্ধ বাবা মোখলেছ শাহ সাহেবের দিকে কিছু না বলে কেবল বোবার মতো চেয়ে রইলাম। আরও অবাক হলাম, উনার প্রধান আসন ঘরটি আমাকে থাকতে দিয়ে ছোট আসন ঘরে তিনি চলে গেলেন। কত অনুরোধ

করলাম, কিন্তু হাসিমুখে বললেন, 'আপনি মেহমান এক পীর সাহেব। আপনার ইজ্জত দেওয়াটা নৈতিক কর্তব্য মনে করি।' আমার পুত্রকে মুরিদ করার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিন্তু মুরিদ না করে পুত্রকে বললেন, তোমার বাবার কাছেই থাকো।

আগের দিনে পীর সাহেবেরা একে-অন্যের সঙ্গে চলাফেরা-আসা-যাওয়া করতেন, কত রকম কথাবার্তা হতো। আর আজ? মনে হয় জাদুঘরে রেখে দেওয়া অবাক করা বিষয়। ফরিদ উদ্দিন আত্তার যদি এ যুগে বেঁচে থাকতেন তো তাযকেরাতুল আউলিয়া নামক ফারসি ভাষায় রচিত বিখ্যাত ওলিদের জীবনী গ্রন্থটির নাম ঠাট্টার ভাষায় হয়তো লিখতেন 'তাযকেরাতুল গাউছুল আজম আল জাদিদ'। বইটি সেই প্রায় দেড়শত বছর আগে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন। আর কেউ তা পুনরায় ছাপাল না। ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের কোরান-এর প্রথম বাংলা অনুবাদটি প্রায় শত বছরের কিছু পরে ঢাকার ঝিনুক পাবলিশার্সের মালিক রুহুল আমিন নিযামী ছাপিয়েছিলেন। উনি অনেক কষ্টে ও পরিশ্রমে সংগ্রহ করা মূল অনুবাদটির দুর্বল কাগজে ছাপাটি আমাকে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাযকেরাতুল আউলিয়া নামক বইটির অনুবাদ আর কোনো পুরাতন লাইব্রেরিতে পেলেন না। এমনকি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজের পাঠাগারেও আর পাওয়া গেল না।

পশ্চিম বাংলা হতে অনেক পরে কোরান-এর অনুবাদটি পুনরায় এক প্রকাশক প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাযকেরাতুল আউলিয়া আর ছাপা হলো না। তখনই রুহুল আমিন নিযামীর কথাটির সত্যতা বুঝতে পারলাম। এখন অবশ্য বাজারে একই নামে একাধিক প্রকাশকের প্রকাশিত বইখানা পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে ফরিদ উদ্দিন আত্তারের লিখার কোনো মিল নাই। বরং সেগুলো পড়লে স্পর্ধার কলেরা রোগে আক্রান্ত হতে হয়। অনুবাদক অনুবাদের নামে যদি নিজেদের কথা ঢুকিয়ে দেয়, তাদেরকে সমালোচনা করতেও রুচিতে বাধে। যেমনটি হয়েছে ইমাম গাজ্জালির নামে এহ্ইয়ায়ে উলুম উদ্দিন বইটির খাস্তা অনুবাদ। লিখক এবং অনুবাদকের সঙ্গে মূল বইটির বিষয়ে অমিল থাকতে পারে, কিন্তু একদম নিরপেক্ষতাই অনুবাদকের নীতি, আদর্শ ও ধর্ম হওয়া কর্তব্য। আমাদের দেশে যা আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। অনুবাদের বিষয়টিতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হলো ইউরোপ আর আমেরিকা। অপ্রিয় হলেও সত্য কথাটি বিবেকের তাড়নায় বলতে বাধ্য হলাম।

চার. আমি স্মরণ করি পীরে কামেল, মাওলাউল আলা, শাহাজাদায়ে গাউসুল আজম হজরত বাবা জিয়াউল হক ভাণ্ডারীকে। আমার লিখনীসমগ্র পড়ার পর তাঁর মুরিদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে এক নজর দেখতে। আমি অধম অতি ব্যস্ততার কারণে যাই যাই করেও আর যাওয়া হলো না। এই মহান ওলির রওজা মোবারকে আমাকে অন্তত একবার যেতেই হবে, ক্ষমা চাইবার জন্য।

পাঁচ. আমি স্মরণ করি ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার জয়লস্কর নামক স্থানের সামান্য কিছু দূরে অবস্থিত বরহাইগুণী দরবার শরিফের পীর বাবা শাহাপীর চিশতি নিজামি বান্দা নেওয়াজিকে। আমি উনার প্রাণঢালা দোয়া পেয়েছি এবং বেশ কয়েক বছর প্রতি ওরসে ওনাকে দর্শন করতে উপস্থিত থাকতাম।

ছয়. আমি স্মরণ করি পীরে কামেল শাহ্জাদায়ে গাউসুল আজম বাবা শফিউল বশর আল হাসানী আল মাইজভাণ্ডারীর যোগ্যতম পুত্র পীরে কামেল শাহ্জাদায়ে গাউসুল আজম বাবা মুজিবুল বশর আল হাসানী আল মাইজভাণ্ডারীকে। উনি একদিন হাসতে হাসতে আমাকে দেখে বললেন যে, ওলিদের মাজারে জাঁকজমকপূর্ণ গিলাপ চড়ানো হয়, আর আপনি জীবিত অবস্থায় জাঁকজমকপূর্ণ শেরওয়ানির গিলাপ পরেছেন। আমি দোয়া করি, আপনার নাম দেশ-বিদেশে একদিন ছড়িয়ে পড়বে, যদিও আপনি প্রচারবিমুখ এবং নিজেকে তাকিয়া নামক ঘোমটায় লুকিয়ে রাখেন।

সাত. আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পরম পূজনীয় শাহ সুফি সৈয়দ ফারুক হুসাইন কাদ্রি আবুল উলাইকে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি ৫৩/১ আলি নেকী দেউড়ী লেন, সাতরওজায় পাকিস্তানি আমলে (তখন বাংলাদেশ হয় নি) আনুমানিক ৪২ বছর আগে উনার খানকা শরিফে বাৎসরিক ওরসে দাওয়াত পেতাম। আমি অধম লিখক প্রতিটি ওরসে এ জন্যই যেতাম যে, উনার দরবারে ফারসি ভাষায় কাওয়ালি হতো। অধম লিখককে আদর করে পাশে বসাতেন এবং একসঙ্গে বসে কাওয়ালি শুনতাম। সেই দিনের ফারসি ভাষার বিখ্যাত কাওয়ালের নাম ছিল সাদেক। অনেক সময় উনি হালে কাঁপতে থাকতেন এবং শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়তেন। সেই মোহনীয় স্মৃতি আজও এই বৃদ্ধ বয়সে মুছে যায় নি। উনি প্রচুর পান খেতেন এবং উনার জ্ঞানের সামনে সামান্য দাঁড়াবার ক্ষমতাটি অধমের ছিল না। উনার বিনয় এবং মার্জিত ভাষা আমাকে আজও অভিভূত করে। উনারই পুত্রের মুরিদ এক স্কুল-শিক্ষিকা আমার রোগী ছিলেন। নির্দিষ্ট সময়-তারিখ করে তাঁর পুত্রকে দেখতে যাই। উনি যথেষ্ট আদর-যত্ন করলেন এবং আমাকে পরিষ্কার চিনতে পারলেন। দুঃখ এই জন্য যে, উনি পর্দা গ্রহণ করেছেন। অপ্রিয় হলেও এই কথাটি সত্য যে, আমার মতো অধমকে তাঁদের আর কোনো অনুষ্ঠানে অজ্ঞাত কারণে দাওয়াত করেন না। তবে বর্তমান পীর সাহেব শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ সোহায়েল কাদ্রি আবু উলায়ীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। আশা করি সুফিবাদের উপর কিছু একটা রেখে যেতে পারবেন।

আট. আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জেসন ফার্মাসিউটিক্যালস গ্রুপ অব কোম্পানিজ-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব মুহম্মদ সলিমউল্লাহ সাহেবকে। আমি এ জন্যই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করছি যে, বিত্ত-বৈভবের চমক এবং ধনৈশ্বর্যের একটি প্রচ্ছন্ন উদ্ধত অহংকার যাঁর মাঝে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া আনতে পারে নি, বরং সুফিবাদের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং বাংলাদেশের বিখ্যাত পীরে কামেল সুফিসাধক খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ্ সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। যাঁর আদর্শ সাইনবোর্ডের বৃত্তের মধ্যে ঘূর্ণায়মান নয়, বরং সার্বজনীন। মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় উনি যে এগিয়ে আসবেন, অধম লেখকের জন্য এটা ছিল একটা অষ্টম আশ্চর্য। সুফিবাদের উপর ভক্তি-সহানুভূতি প্রদর্শন করা এক বিষয়, আর মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করাটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

সাগরে উত্তাল ঊর্মির অবস্থানে ব্যক্তিসত্তা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিত্ত-বৈভবের সাগরে ব্যক্তিসত্তার নৌকা প্রায়ই আত্মশ্লাঘার মেকি আভিজাত্যের বেসুরা ঝংকার তোলে, আমিত্বের কণ্ঠকুনিকায়। বিশ্লেষণের জিজ্ঞাসা এখানে পঙ্গু ও স্থবিরতার মূর্তি ধারণ করে। রাহুগ্রাসে চন্দ্র-সূর্য যেভাবে কিছুক্ষণের জন্য আপন সত্তাকে বিবর্ণ করে, তেমনি বিত্ত-বৈভবের মালিক যারা তাদেরকেও সেইভাবে কখনও কখনও মোহাচ্ছন্ন করে তোলে। বিত্তবৈভবের নেশা যখন সম্রাটের

সিংহাসনে আরোহণ করে, তখন সমস্ত প্রকার মাদকদ্রব্যগুলো উজির-নাজিরের মতো কুর্নিশ করে। কিন্তু জগতে এই বিস্ময়কর বিষয়েও ব্যতিক্রম রেখে দিয়েছেন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা। খলিফা আবু বকর সিদ্দিক, জুন্নুন্নুরাইন হজরত ওসমান গনি, মর্ত্যে অবস্থানকালে স্বর্গের সুসংবাদ পাওয়া সাহাবা আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সম্রাটের সিংহাসন থেকে স্বেচ্ছায় নেমে এসেছেন ইব্রাহিম আদ্হাম বল্খি, শাহ সুজা কেরমানওয়ালা, আল্লামা আবদুর রহমান জামি, মোহাম্মদ ইবনে হাসান (দাতা গঞ্জে বখশ) আর এই একবিংশ শতাব্দীতেও এরই সামান্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাই কিছু কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তিতে। আশ্চর্য, তারই কি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে চিহ্নিত করা যায় না সলিম উল্লাহ সাহেবকে?

নয়. আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমার জন্মদাতা কেরানীগঞ্জ থানার প্রথম এমএ, বি টি, মরহুম হেলাল উদ্দিন আহমদ-এর আপন ভাই শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি ওরফে কালু শাহ সাহেবকে। কিশোর বয়সে বাবাকে হারাবার পর যিনি আমাকে বুকে তুলে নিয়েছেন, শিক্ষাদান করেছেন এবং সুফিবাদের দেশে কেমন করে অগ্রসর হতে হয় সেই শিক্ষাটি সর্বপ্রথম তিনিই দিয়েছেন। উনি আমার আধ্যাত্মিক গুরু না হতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক গুরুর সম্মান প্রদর্শন করি। যদিও ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো কোনো প্রশ্নে-মতের অমিল থাকতে পারে, কিন্তু কোনো সংশয় থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না। উনার কোরান তফসিরটি পৃথিবীর বিখ্যাত যে কয়টি কোরান তফসির আছে তারই মধ্যে অন্যতম। আমার আরেক চাচা শাহীন স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল এবং কেরানীগঞ্জ উপজেলার প্রথম গ্রুপ ক্যাপ্টেন মরহুম কামাল উদ্দিন আহমদ সাহেবকে স্মরণ করি। আমি স্মরণ করি আমার ছোট চাচা কর্নেল, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, উকিল এবং প্রফেসর শরফুদ্দিন আহমদ সাহেবকে। আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারছি না যে, একজন মানুষ এতগুলো গুণের অধিকারী সমগ্র বাংলাদেশের আর একজন আছে কিনা সন্দেহ। আমি স্মরণ করি আমার প্রাণপ্রিয় ফুপু, যাঁর বুকের দুধ পান করেছি এবং যিনি পুত্রস্নেহে লালনপালন করেছেন, সেই মরহুমা শামসুন্নাহার ওরফে লোরার মাকে।

দশ. আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই আমারই গ্রাম চুনকুটিয়ার চৌধুরী পাড়ায় অবস্থিত প্রাক্তন সংসদ সদস্য মরহুম আজিজুর রহমান চৌধুরী ওরফে জুলু চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র সুফিবাদে বিশ্বাসী এবং শামপুরী শাহ সাহেবের মুরিদ ও খলিফা, পরম পূজনীয় আমার শিক্ষাগুরু, জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরী (এমএ, এলএলবি) সাহেবকে। যিনি আমাকে ধর্ম বিষয়ে গবেষণা করার জন্য উৎসাহ দান করেছেন এবং আমার সর্ববিষয়ে সু-পরামর্শ দান করেছেন এবং সব সময় আমার মঙ্গল কামনা করেন। আমি মাওলার কাছে তাঁর জন্য রহমত কামনা করি। আরও উল্লেখ্য যে, ধনসম্পদ, জ্ঞানগরিমায় এবং বংশমর্যাদায় কেরানীগঞ্জ উপজেলায় এত উন্নতমানের বংশ আর দ্বিতীয়টি আছে বলে অধম লেখকের জানা নাই।

এগারো. পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আমার দাদুকে যিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হতে আগমন করেছিলেন এবং একজন সুফি সাধক হিসেবে আসামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর নাম কাজিম উদ্দিন আহমদ। দাদু বলেছিলেন 'আমার বংশের কেহই ঘুষ খেতে পারবে না। অদৃশ্য শক্তি তাকে বাধা দেবে এবং তারই জ্বলন্ত প্রমাণ দেখতে পাই যখন আমার চাচাতো ভাইবোনেরা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ইনকামট্যাক্সের ডেপুটি কমিশনার, কেউ এফআরসিএস ডাক্তার, কেউ হাইকোর্টের পেশকার ছিলেন। তাঁরা জীবনে একটি টাকাও ঘুষ খেতে পারেন নি। তাঁরা অকপটে আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি এই অবৈধ উপার্জন হতে বাধা প্রদান করে।

বারো. পরিশেষে, আমি স্মরণ করি আমার বড় মামা আবুল কালাম আজাদ এমএ, এমকম, এলএলবিকে। হয়তো তাঁর মনের মাঝে কিছুটা দুঃখ থাকতে পারে যে তারই আপন ভাই আবদুল মতিন ওরফে তারা মিয়া হাজি সাহেব যিনি দাড়িতে সদাসর্বদা মেহেদি লাগানোর সুন্নত পালন করেন, আমি তার নিকট হতে চার বিঘা জমি ক্রয় করেছিলাম, কিন্তু আপন মামা ভেবে দলিল করি নি। অবশেষে বিক্রয় করার বিষয়টি তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন (সোবহানাল্লাহ!)। আমার এই মহান হাজি তারা মিয়া মামাকে আমার লিখনীতে কাছেই রেখে গেলাম (সোবহানাল্লাহ!) এবং প্রিয় পাঠক বাবারা এবং মায়েরা আমার এই মামার দেদীপ্যমান কীর্তিকলাপ পড়বার পর আশা করি সোবহানাল্লাহ পড়বেন।

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী
গ্রাম : চুনকুটিয়া (মধ্যপাড়া)
ডাকঘর : শুভাঢ্যা, থানা : কেরানীগঞ্জ
জেলা : ঢাকা

যারা সাধনায় আগ্রহী তাদের প্রতি অনুরোধ

আমরা, বাবার সাধক ভক্তরা, কি বলতে পারি না যে, শত বছরে জগতের মাঝে আর একটি এমন প্রতিভাবান জাহাঙ্গীরের জন্ম হবে কি? ধ্যানসাধনার এত সহজ নিয়মে এগিয়ে গিয়ে রহস্যলোকের কিছু দর্শন করার নিশ্চয়তাটি কি একটি বোবা চ্যালেঞ্জ নয়? এই চ্যালেঞ্জ বাবার বইতে নাই, আছে নব্বই মিনিটের কয়টি অডিও ক্যাসেটে/সিডিতে। এই কথাটি কি কেউ সাহস করে বলতে পারবে যে, 'ধ্যানসাধনা করে যদি কিছু না পাও তো আমাকে ফেলে অন্য গুরু ধরিও?' এই কথাটি কি শুনেছেন যে, 'জীবনভর বাবা বাবা ডাকবে অথচ পাবে না কিছুই, তা হলে এই বাবা ডাকার সার্থকতা কোথায়?' আমরা শ্রদ্ধেয় ওহাবি মতবাদে বিশ্বাসীদের এবং শ্রদ্ধেয় শিয়া মতবাদে বিশ্বাসীদেরকে পর্যন্ত আহ্বান করছি এই ধ্যানসাধনাটি করতে। কেবলমাত্র এই একটি প্রশ্নে আপনার বিবেকটিকে নিরপেক্ষভাবে জিজ্ঞেস করুন, আর কোথাও কি এ রকম বোবা চ্যালেঞ্জটি একটিবারও শুনতে পেয়েছেন? আমরা পৃথিবীর যে কোনো ধর্মে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করছি, আসুন সত্যতা যাচাই করার জন্য। বারুদির শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর গুরু বাবা গফুর শাহ মুসলমান হওয়াতে কি কোনো দোষ আছে? শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-এর গুরু বাবা গেন্দু শাহ হওয়াতে কি কোনো দোষ আছে? গুরু নানকের গুরু বাবা বাহ্‌লুল দানা হওয়াতে কি কোনো দোষ আছে? বাবা হরদেওর গুরু বাবা মাহ্‌বুবে এলাহি নিজাম উদ্দিন আউলিয়া হওয়াতে কি কোনো দোষ? বাবা কবিরের গুরু হিন্দু ব্রাহ্মণ হওয়াতে কি কোনো দোষ আছে? ভক্ত কবিয়াল রমেশ চন্দ্র শীলের কি গাউসুল আজম বাবা ভাণ্ডারীর মুরিদ হওয়াতে কোনো দোষ আছে? কারণ আধ্যাত্মিক গুরুর কোনো জাত থাকে না। জাত তাদেরই কাছে থাকে যারা ধর্মীয় সাইনবোর্ডে বিশ্বাসী। বাণীপাঠ করিয়ে ধর্ম বদলানো যায়, কিন্তু রক্তের ও-নেগেটিভকে কখনোই ও-পজিটিভ করা যায় না। আমাদের বাবা শিশুর মতো সরল, কোটি টাকা আর বিত্ত-বৈভবের চাকচিক্য লাথি দিয়ে ফেলে দিয়েছেন। লোভ-মোহ যাঁকে বিন্দুমাত্র গ্রাস করতে পারে নি। বাবার গুরু শাহ সুফি মাওলানা শাহ জালাল নূরী আল সুরেশ্বরী বাবাকে বিনয়ের সম্রাট বলতেন এবং বাবার গুরু ভাইয়েরা সবাই বাবাকে ভক্তি করেন। বাবা নিজেকে এমনভাবে ছোট করে ফেলেন যে, আমরা অবাক হই এবং অনেক নবাগতের মাঝে সংশয়ের ধূম্রজাল তৈরি হতে দেখি। এই যুগে আর কোনো গুরু কি অকপটে বলতে পেরেছেন যে, 'আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রশ্নে শত শত গুরু বদলাতে পারো।' যদি আমাদের কথাগুলো আপনার বিবেকের দরজায় আঘাত হানে তো আসুন এবং ভক্ত হয়ে সাধনা করতে দোষ কোথায়? এমন কথাটি কি জীবনে শুনেছেন যে, আপনার গুরু তিনটি স্তর তথা মোকাম পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং চরমে আর গুরু থাকেন না এবং শয়তানও থাকে না; চরম পর্যায়ে সাধক নিজেই গুরু, নিজেই শিষ্য এবং এখানেই আনা সুবহানি তথা 'আমিই ভাসমান'। আমাদের এই অনুরোধ কেবলমাত্র ধ্যানসাধনায় যারা আগ্রহী তাদের জন্য। এবং বাবার ভাষণের মাত্র দুটো অডিও ক্যাসেট/সিডি শুনে দেখুন না, বাবা কী বলছেন?

বাবার সাধক ভক্তবৃন্দ
০৭.১২.০৩

সুফিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন

১. সারমাদ্ দার্‌দী আজব শিকাস্তা কার্‌দী।
এ কোন প্রচণ্ড হৃদয়ের বেদনায় কী অদ্ভুত রূপ আমার সর্বঅঙ্গে ধারণ করিয়েছ, কেবলই তুমি।

২. ঈমা বা ফেদায়ে চাশ্‌মে মাস্তে কার্‌দী।
আমার সব কিছু এমনকি বুদ্ধি-জ্ঞান আর প্রখরতার প্রতিভাগুলো, একদম অকেজো করে দিল কেবলই তোমার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন চোখ দুটো।

৩. উমরে কে বায়াতো আহাদিস গুজাস্তে।
অনন্ত অনাদিকালের গোলাম হয়ে কাটিয়ে দেয়ার দয়া হতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না।

৪. রাফতি ও নেসারে বুত্ পারাশ্‌তে কার্‌দী।
কারণ, সব কিছু স্বেচ্ছায় হারিয়ে তুমি আমাকে তো কেবলই পীরপূজারক বানিয়ে দিলে।

হজরত আমির খসরু
(মাহবুবে এলাহি নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার প্রধান খলিফা)

পীরপূজাই আল্লাহ্‌র পূজা : সুফিবাদের সর্বোচ্চ দর্শনটি হজরত আমির খসরুর এই কালামে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে

ঈদ গাহে মা গারিবা কুয়ে তো।
এই গরিবের খুশির ঈদের মাঠটি হলো তোমারই গলিতে (সরু রাস্তা, চিকন পথ, উঠান, দুয়ার, আঙিনা)।
উমেরে ছাতে দিদে দিদাম কুয়ে তো।
আমার অতি পরিচিত জীবনসাথীকে তাঁর আসল রূপে তোমারই গলিতে দেখলাম।
কাবা-এ-মান কেবলায়ে মান কুয়ে তো।
আমারই কাবা, আমারই কেবলা তো একমাত্র তোমারই গলিতে।
সেজদা গাহে মা আশেকারা আব্ কুয়ে তো।
প্রেমিকদের সেজদার একমাত্র স্থানটি তো শুধুমাত্র তোমারই গলিতে।
ছদ হাজারা ঈদ-ও কুরবা নাদকুনাম।
কতশত খুশির ঈদ আর কুরবানি তুচ্ছ হয়ে যায় যখন তোমারই গলিতে অবস্থান করি।
আয় হেলালে মা আব কুয়ে তো।
মারেফতের রহস্যের সদ্য উদিত চাঁদ দেখা পাবার স্থানটি তো তোমারই গলিতে।
দাস্তে কুশা জানিবে বেদম পীরে মা আব রিনদানে হিম্মতে মা কুয়ে তো।
তোমারই হাতের সোহাগ-মাখা স্পর্শ, ওগো আমার পীর, আমার অন্ধত্ব দূর করে দেয়। আর জীবনটা থেকেও মৃত্যুর ছোঁয়ায় রহস্যের আলোতে শিহরিত হয়,
ক্ষণে ক্ষণে অজানা জিজ্ঞাসায় কেঁপে ওঠে। যিনি পা হতে মাথা পর্যন্ত নূরে
নূরময়, সেই তুমিই তো আমার পীর। তোমারই নূরের সাহসী ধারা অর্জন করতে পেরেছি বলে কেবল তোমারই গলিতে পড়ে থাকি।
ইয়া নিজাম উদ্দিন মাহবুবে খোদা।
ওগো নিজাম উদ্দিন, খোদার বন্ধু।
জুমলা মাহবুবা গোলামে কুয়ে তো।
কেবলই প্রেয়সী হয়ে আছ তাদের কাছে, যারা দাসত্বের
শৃংখল তোমারই গলিতে আপন ইচ্ছায় বরণ করে নিতে পেরেছে।

কোরান অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা

আমরা কোরান-এর হুবহু অনুবাদ কর্মটি সর্বপ্রথম করে চলছি, আশা করি সম্পূর্ণ কোরান-এর অনুবাদটি দুই-তিন বছরের মধ্যে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারবো। আমরা অকপটে এ-ও স্বীকার করছি যে, কোরান-এর হুবহু অনুবাদ করতে গিয়ে যদি কোথাও বুঝতে না পারি, তা-ও লিখে দিব। আমরা বিশ্বাস করি, মহান রাব্বুল আলামিনের কোরান-এর সবটুকু অনুবাদ বুঝবার শক্তি আমাদের নাই। অতি দুঃখে এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই বিষয়টিও পাঠকদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, কোরান-এর অনুবাদ কেবল মনগড়া নয়, বরং সম্পূর্ণ উল্টাপাল্টা এবং বিকৃত, বানোয়াট অনুবাদ অনেক স্থানেই দেখতে পাই। আমরা এই কোরান-এর অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক আরবি ডিকশনারি এবং কোরান-এর লোগাতসমূহ বহু কষ্ট করে সংগ্রহ করেছি। আমাদের এই কোরান অনুবাদের বিরাট কার্যটি কতটুকু সফল এবং সার্থক হয়েছে তা নির্ণয়ের ভার পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম। তবে আমাদের কাছে অনেক অনেক অনুরোধ এসেছে কোরান-এর অনুবাদটি করার জন্য। আমরা এতকাল এ জন্যই ধৈর্য ধারণ করেছি যে, এই কোরান-এর অনুবাদ করতে গেলে কোরান-এর অনেক নতুন-পুরাতন লোগাত (অভিধান) এবং প্রচলিত যত প্রকার আরবি ডিকশনারি পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করতে হবে। কেবল তাই নয়, আমরা কোরান-এর আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি এবং বাংলা তফসির সংগ্রহ করতে গিয়ে বৈরুত, মিসর, তেহরান, লাহোর, দিল্লি হতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কোরান-এর তফসির সংগ্রহ করেছি। আমরা তাড়াহুড়ো করে অথবা ঝটপট করে কোরান-এর অনুবাদটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে চাই না। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বইতে কোরান-এর একটি সূরা 'নজম'-এর অনুবাদটি হুবহু তুলে ধরলাম। [বর্তমান সংস্করণে (২০০৮) সূরা 'তোয়াহা'-র অনুবাদও দেওয়া হলো]। পাঠক বাজারে প্রচলিত অন্যান্য অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন আমাদের এই প্রয়াস কতটুকু সার্থক হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কোরান-এর অনুবাদে যে-যে স্থানে সম্পূর্ণ উল্টাপাল্টা, মনগড়া, বিকৃত অনুবাদ করা হয়েছে সেটাও প্রচলিত অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার অনুরোধ করছি। আমাদের কথাগুলোতে একটা ঔদ্ধত্যের গন্ধ অনেকেই নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খুঁজতে চাইবেন। কিন্তু আমরা জোর গলায় বলতে পারি যে, আপনাদের বিবেকের দৃষ্টিশক্তি বিস্ফারিত হয়ে আপনাদের কাছেই ফেরত আসবে। এরপরও আমরা অকপটে স্বীকার করব যে, আমাদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও যদি সামান্য ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে উহা আমাদেরকে জানিয়ে দিলে আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, ভণ্ডামি করার চাইতে ভুল স্বীকার করে নেওয়া অনেক শ্রেয়।

সূরা নজমের অনুবাদ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১. ওয়ান্ নাজমে ইজা হাওয়া।
এবং তারকাসমূহ (ওয়ান্ নাজমে) যখন নিজ প্রবৃত্তির অধীন হয় (ইজা হাওয়া)।

২. মা দাল্লা সাহেবুকুম ওয়ামা গাওয়া।
তোমাদের সাথী (সাহেবুকুম) বিপথগামী নহে (মা দাল্লা) এবং বিভ্রান্তও নহে (ওয়া মা গাওয়া)।

৩. ওয়া মা ইয়ানতেকু আনিল হাওয়া।
এবং (তিনি) কথা বলেন না (ওয়া মা ইয়ানতেকু) নিজ প্রবৃত্তি হইতে (আনিল হাওয়া)।

৪. ইন্ হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুই ইউহা।
যদিও উহা (ইনহুয়া) হুকুম করে (ওয়াহ্য়ুই) ওহি ছাড়া নয় (ইল্লা ইউহা)।

৫. আল্লামাহু শাদিদুল কুয়া।
তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় (আল্লামাহু) অনেক শক্তিশালী (কুয়া) শক্তির মাধ্যমে (শাদিদ)।

৬. জূ মেররাতিন, ফাস্তাওয়া।
তিনি নিজেকে দেখিয়াছেন (জূ মেররাতিন)। সুতরাং তিনি স্থির হইয়াছেন (ফাস্তাওয়া)।

৭. ওয়া হুয়া বিলউফুকিল আলা।
এবং তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ (ওয়া হুয়াল আলা) আকাশ দিগন্তে (বিলউফুকে)।

৮. সুম্মা দানা, ফাতাদাল্লা।
তারপর (তিনি) নিকটে আসিলেন (সুম্মা দানা) সুতরাং অতি নিকটে (ফাতাদাল্লা)।

৯. ফাকানা কাবা কাওসাইনে আও আদ্না।
সুতরাং (তিনি) ছিলেন (ফাকানা) দুই ধনুকের ব্যবধানে (কাবা কাওসাইনে) অথবা আরও নিকটে (আও আদ্না)।

১০. ফাআওহা ইলা আব্দেহী মা আওহা।
সুতরাং ওহি করিলেন (ফা আওহা) তাঁহার বান্দার দিকে (ইলা আব্দেহী) যাহা ওহি করিবার (মা আওহা)।

১১. মা কাজাবাল ফুয়াদু মা রাআ।
তাঁহার অন্তকরণ (ফুয়াদ) অস্বীকার করে নাই (মা কাজাবা) যাহা তিনি দেখিয়াছেন (মা রাআ)।

১২. আফাতুমারুনাহু আলা মা ইয়ারা।
তোমরা কি তাঁহাকে অপবাদ দিবে? (আফাতুমারুনাহু) যাহা উপরে (তিনি) দেখিয়াছেন (আলা মা ইয়ারা)।

১৩. ওয়া লাকাদ রাআহু নাজলাতান উখ্রা।
এবং অবশ্যই তিনি দেখিয়াছেন (ওয়া লাকাদ রাআহু) নাজেল (অবতীর্ণ) অবস্থায় (নাজলাতান) দ্বিতীয়বার (উখ্রা)।

১৪. এনদা সেদরাতিল মুনতাহা।
নিষিদ্ধ (মুনতাহা) কুলবৃক্ষের (বরই) নিকটে (এন্দা সেদরাতে)।

১৫. এনদা হা জান্নাতুল মাওয়া।
উহা ছিল জান্নাতুল মাওয়ার নিকটে।

১৬. এজ্ ইয়াগশাস সিদরাতা মা ইয়াগ্শা।
যখন কুলবৃক্ষটি অন্ধকারেই আচ্ছাদিত ছিল (এজ্ ইয়াগ্শাস সিদরাতা) যেভাবে অন্ধকারে আচ্ছাদিত হবার (মা ইয়াগ্শা)।

১৭. মা জাগাল্ বাসারু ওয়া মা তাগা।
(তাঁহার) দৃষ্টিশক্তি ঢাকিয়া ছিল না (মা জাগাল্ বাসারু) এবং তিনি সীমা অতিক্রমও করেন নাই (ওয়া মা তাগা)।

১৮. লাকাদ রাআ মিন আয়াতে রাব্বেহিল কুবরা।
অবশ্যই (তিনি) দেখিয়াছেন (লাকাদ রাআ) তাঁহার রবের (নিকট) হইতে বড় আয়াত (নিদর্শন)। (মিন আয়াতে রাব্বেহিল কুবরা)।

১৯. আফারাআইতুমুল লাতা ওয়াল উজ্জা।
তোমরা কি দেখিয়াছ (আফারাইতুম) লাত এবং উজ্জাকে?

২০. ওয়া মানাতাস্ সালেসাতাল উখ্রা।
এবং আরও একটি তৃতীয় মানাতকে?

২১. আলাকুমুজ জাকারু ওয়া লাহুল উনসা।

তোমাদের জন্য কি পুরুষ (আলাকুমুজ জাকারু)! এবং তাঁহার জন্য কি নারী? (ওয়া লাহুল উনসা)।

২২. তিলকা ইজান কেসমাতুন দিজা।
এটাই! (তিলকা) যখন বণ্টন পদ্ধতিটি হয় (ইজান কেসমাতুন) পক্ষপাতদুষ্ট (দিজা)।

২৩. ইন হিয়া ইল্লা আসমাউন সাম্মাইতুমুহা আনতুম ওয়া আবাউকুম মা আন্জালাল লাহু বেহা মিন সুলতানিন, ইন ইয়াত্তাবেউনা ইল্লাজ জান্না ওয়া মা তাহ্ওয়াল আনফুসু, ওয়া লাকাদ জাআহুম মের রাব্বেহিমুল হুদা।
এইগুলি কিছুই নয়! অথচ কিছু নামসমূহ (ইনহিয়া ইল্লা আস্মাউন) যাহাদের নামগুলি তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা রাখিয়াছিল (সাম্মাইতুমুহা আনতুম ওয়া আবাউকুম) আল্লাহ্ এই বিষয়ে তাঁহার বিধান হইতে কিছুই নাজেল (অবতীর্ণ) করেন নাই। (মা আনজালাল লাহু বেহা মিন সুলতানিন)। তোমরা তাহাই অনুসরণ করো অথচ যাহা তোমাদের ধারণায় আসে (ইন ইয়াত্তাবেউনা ইল্লাজ জান্না) এবং যাহা তোমাদের নফ্সসমূহের (প্রবৃত্তি) ইচ্ছায় আসে (ওয়া মা তাহ্ওয়াল আনফুসু) এবং অবশ্যই তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রব হইতে হেদায়েত (পথ নির্দেশ)। (ওয়া লাকাদা জা আহুম মের রাব্বেহিমুল হুদা)।

২৪. আম লিল্ ইনসানে মা তামান্না।
মানুষের জন্য কি তাহা প্রযোজ্য! (আমলিল্ ইনসানে) যাহা সে আশা করে? (মা তামান্না)।

২৫. ফালিল্লাহিল আখেরাতু ওয়াল উলা।
সুতরাং আল্লাহ্র জন্যই শেষ এবং শুরু (আখেরাতু ওয়াল উলা)।

২৬. ওয়াকাম মিন মালাকিন ফিস সামাওয়াতে লা তুগনি শাফাআতুহুম শাইয়ান ইল্লা মিন বাআদে আইঁইয়াজানাল্লাহু লেমাই ইয়াশাউ ওয়া ইয়ারদা।
এবং আকাশের মধ্যে কতক ফেরেস্তা হইতে রহিয়াছে। (ওয়া কাম মিন মালাকিন ফিস সামাওয়াতে)। তাহারা কেহই কোনো বিষয়েই সুপারিশ করিতে সক্ষম নয় (লা তুগনি শাফা আতুহুম শাইয়ান) একমাত্র যতক্ষণ না আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হুকুম করেন। (ইল্লা মিন বাআদে আইইয়াজানাল্লাহু) অথবা যাহার উপর তিনি ইচ্ছা করেন এবং সন্তুষ্ট থাকেন (লেমাই ইয়াশাউ ওয়া ইয়ারদা)।

২৭. ইন্নাল্লাজিনা লা ইউমেনুনা বিল আখেরাতে লাইউসাম্মুনাল মালায়িকাতা তাসমিয়াতুল উনছা।
নিশ্চয়ই যাহারা আখেরাতের প্রতি ইমান রাখে না (ইন্নাল্লাজিনা লা ইউমেনুনা বিল আখেরাতে) তাহারা ফেরেস্তাদের জন্য নাম রাখে নারীবাচক নাম হইতে। (লাইউসাম্মুনাল মালায়িকাতা তাসমিয়াতুল উনছা)।

২৮. ওয়ামা লাহুম বিহি মিন এলমিন, ইঁইয়াত্তাবেউনা ইল্লাজ জান্না, ওয়া ইন্নাজ জান্না লা ইউগনি মিনাল হাক্কে শাইয়ান।
এবং তাহাদের জানা নাই জ্ঞান হইতে কোনো বিষয়ে। (ওয়ামা লাহুম বিহি মিন এলমিন) তাহারা অনুসরণ করে একমাত্র অনুমানের। (ই-ইয়াত্তাবেউনা ইল্লাজ জান্না) এবং নিশ্চয়ই অনুমান কখনও সত্য হইতে সক্ষম নয় (ওয়া ইন্নাজ জান্না লা ইউগনি মিনাল হাক্কে শাইয়ান)।

২৯. ফাআরেদ আনমান তাওয়াল্লা আন জিক্রিনা ওয়া লাম ইউরেদ ইল্লাল হায়াতাদ দুনিয়া।
সুতরাং যাহারা আমাদের জিকির (স্মরণ) হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে (ফা আবেদ আনমান তাওয়াল্লা আন জিক্রিনা) তাহাদেরকে (আরেদ) এড়াইয়া চলো এবং তাহারা কোনো কিছুই আশা করে না দুনিয়ার জীবন ব্যতীত। (ওয়ালাম ইউরেদ ইল্লাল হায়াতাদ দুনিয়া)।

৩০. জালিকা মাব্লাগুহুম মিনাল এলমে, ইন্না রাব্বাকা হুয়া আলামু বেমান দাল্লা আন্ সাবিলিহি ওয়া হুয়া আলামু বেমানিহ্ তাদা।
জ্ঞান বিষয়ে তাহাদের দৌড় ঐ পর্যন্তই। (জালিকা মাবলাগুহুম মিনাল এলমে) নিশ্চয়ই তোমার রব ভালোই জানেন কে বিপথগামী তাঁহার পথ হইতে। (ইন্না রাব্বাকা হুয়া আলামু বেমান দাল্লা আন্ সাবিলিহি) এবং তিনি ভালোই জানেন কে সু-পথপ্রাপ্ত (ওয়া হুয়া আলামু বেমানিহ্ তাদা)।

৩১. ওয়া লিল্লাহে মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আর্দে লেইয়াজযিয়াল লাজিনা আসাউ বেমা আমেলু ওয়া ইয়াজ্যিয়াল্ লাজিনা আহসানু বিলহুসনা।
এবং আকাশের মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র জন্য। (ওয়া লিল্লাহে মাফিস্ সামাওয়াতে ওয়া মা ফিল আরদে)। যাহাদের কর্মগুলো মন্দ, তাহাদের জন্য মন্দ পুরস্কার (লেইয়াজ যিয়াল লাজিনা আসাউ বেমা আমেলু) এবং যাহারা সৎ কর্ম করে তাহাদের পুরস্কার অতি উত্তম। (ওয়া ইয়াজযিয়াল লাজিনা আহ্সানু বিলহুসনা)।

৩২. আল্লাজিনা ইয়াজতানেবুনা কাবাইরাল ইস্মে ওয়াল ফাওয়াহেশা ইল্লাল লামামা, ইন্না রাব্বাকা ওয়াসেউল মাগফেরাতি, হুয়া আলামু বেকুম এজআন্শাআকুম মিনাল আরদে ওয়া এজ্ আনতুম আজিন্নাতুন ফি বুতুনে উম্মাহাতেকুম, ফালা তুজাক্কু আনফুসাকুম, হুয়া আলামু বেমানিত্তাকা।
যাঁহারা নিজেদেরকে বিরত রাখে বড় বড় পাপ এবং ফাহেশা (অশ্লীল) কর্ম হইতে ছোট পাপ ব্যতীত। (আললাজিনা ইয়াজাতানেবুনা কাবাইরাল এস্মে ওয়াল ফাওয়াহেশা ইল্লাল্ লামামা)। নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমা বিষয়ে অপরিসীম (ইন্না রাব্বাকা ওয়াসেউল মাগফেরাতে), তিনি তোমাদের বিষয়ে ভালোই জানেন, যখন তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন পৃথিবী হইতে (হুয়া আলামু বেকুম এজ্ আনশায়াকুম মিনাল আরদে) এবং যখন তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটের মধ্যে ভ্রূণরূপে (সৃষ্টি করিয়াছেন)। (ওয়া এজ্ আনতুম আজেন্নাতুন ফি বুতুনে উম্মাহাতেকুম)

সুতরাং তোমরা তোমাদের নফ্সের পবিত্রতা প্রকাশ করিও না (ফালা তুজাককু আনফুসাকুম) তিনিই ভালো জানেন তোমাদের মধ্যে কে তাকওয়াকারী (হুয়া আলামু বেমানিত্তাকা)।

৩৩. আফারা আইতাল্লাজি তাওয়াল্লা।
তুমি কি দেখিয়াছ তাঁহাকে! (আফারা আইতাল্লাজি) যে মুখ ফিরাইয়া নেয়? (তাওয়াল্লা)।

৩৪. ওয়া আতা কালিলান ওয়া আক্দা।
এবং দান করে সামান্য এবং তাকিদ দেয় (আক্দা)।

৩৫. আ-এনদাহু এলমুল গাইবে ফাহুয়া ইয়ারা।
তাহার নিকট কি গায়েবের (অদৃশ্য) জ্ঞান আছে? সুতরাং সে কি উহা দেখে? (ফাহুয়া ইয়ারা)।

৩৬. আম্লাম ইউনাব্বা বেমা ফি সহুফে মূসা।
তাহাকে কি খবর দেওয়া হয় নাই! যাহা আছে মুসার কেতাব-এর মধ্যে? (ফি সুহুফে মূসা)।

৩৭. ওয়া ইব্রাহীমাল্লাজি ওয়াফ্ফা।
এবং ইব্রাহিম, যিনি (দায়িত্ব) পরিপূর্ণকারী (ওয়াফ্ফা)।

৩৮. আল্লা তাজেরু ওয়াজেরাতুন বিজরা ওখ্রা।
সাবধান (আল্লা) একে-অপরের বোঝা বহন করিবে না (ওয়াজরাতুন বিজরা ওখ্রা)।

৩৯. ওয়া আল্ লাইসা লিল্ ইনসানে ইল্লা মাসাআ।
এবং মানুষের জন্য কিছুই নাই, তাহার প্রচেষ্টা (সাআ) ব্যতীত।

৪০. ওয়া আন্না সাইয়াহু সাওফা ইউরা।
এবং নিশ্চয়ই তাহার প্রচেষ্টাকেই (সাইয়াহু) অচিরেই (সাওফা) সে দেখিবে (ইউরা)।

৪১. সুম্মা ইউজ্জাহুল জাজাআল আওফা।
তারপর তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে (ইউজ্জাহু) একটি পরিপূর্ণ পুরস্কার (জাজাআন আওফা)।

৪২. ওয়া আন্না ইলা রাব্বিকাল মুনতাহা।
এবং নিশ্চয়ই তোমার রবের দিকেই তোমার শেষ পরিণতি (মুনতাহা)।

৪৩. ওয়া আন্নাহু হুয়া আদ্হাকা ওয়া আবকা।
এবং নিশ্চয়ই তিনিই (তোমাকে) হাসান (আদহাকা) এবং (তোমাকে) কাঁদান (আবকা)।

৪৪. ওয়া আন্নাহু আমাতা ওয়া আহ্ইয়া।
এবং নিশ্চয়ই তিনি (তোমাকে) মৃত্যু (আমাতা) দেন এবং জীবন (আহিয়া) দান করেন।

৪৫. ওয়া আন্নাহু খালাকাজ জাওজাইনিজ জাকারা ওয়াল উনছা।
এবং নিশ্চয়ই তিনিই নারী (উনছা) এবং পুরুষ (জাকারা) যুগল (জাওজাইনে) সৃষ্টি করিয়াছেন।

৪৬. মিন নুত্ফাতিন ইজা তুমনা।
বীর্য (নুত্ফাতিন) হইতে যাহা ছিল ঘুমন্ত (তুমনা)।

৪৭. ওয়া আন্না আলাইহিন্ নাশাতাল উখ্রা।
এবং নিশ্চয়ই আমরা চাইব (নাশাতা) আর একবার (উখ্রা) তাহার উপরে (আলাইহে)।

৪৮. ওয়া আন্নাহু হুয়া আগ্না ওয়া আক্না।
এবং নিশ্চয়ই তিনি সম্পদশালী (আগ্না) করেন এবং প্রাচুর্যতা (আক্না) দান করেন।

৪৯. ওয়া আন্নাহু হুয়া রাব্বুশ শেরা।
এবং নিশ্চয়ই তিনিই শক্তিশালী নক্ষত্রের (শেরা) রব।

৫০. ওয়া আন্নাহু আহলাকা আদানিল উলা।
এবং নিশ্চয়ই তিনিই প্রথম (উলা) আদ জাতিকে ধ্বংস (আহ্লাকা) করিয়াছেন।

৫১. ওয়া সামুদা ফামা আব্কা।
এবং সামুদ জাতিকে সুতরাং (রহিল না কেহ) অবশিষ্ট (আবকা)।

৫২. ওয়া কাওমা নূহিন মিন কাবলি ইন্নাহুম কানু হুম আজলামা ওয়া আত্গা।
এবং পূর্ব হইতেই (ছিল) নুহের কাওম, নিশ্চয়ই তাহারা ছিল অধিক জালেম (আজলামা) এবং অধিক অবাধ্য (আত্গা)।

৫৩. ওয়াল মোতাফেকাতা আহওয়া।
এবং বস্তিগুলিকে (মোতাফেকাতা) উল্টাইয়া দিলেন (আহওয়া)।

৫৪. ফা গাশ্শাহা, মা গাশ্শা।

সুতরাং উহাদেরকে অন্ধকারে ঢাকিয়া দিলেন (ফা গাশ্‌শাহা) যেভাবে অন্ধকারে ঢাকার প্রয়োজন ছিল (মা গাশ্‌শা)।

৫৫. ফাবেআইয়ে আলায়ে রাব্বিকা তাতামারা।
সুতরাং তুমি তোমার রবের কোন নেয়ামতকে (আলায়ে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে (তাতামারা)?

৫৬. হাজা নাজিরুম মিনান নুজুরিল উলা।
এই ভয় প্রদর্শনকারী তো (নাজিরুম) প্রথম ভয় প্রদর্শনকারীগণ হইতে? (মিন নুজুরিল উলা)।

৫৭. আজেফাতিল আজেফাতু।
যাহা আসিবার (আজেফাত) তাহা আসিবেই (আজেফাতু)।

৫৮. লাইসা লাহা মিন দুনিললাহে কাশেফাতুন।
তাদের জন্য কেহই নাই (লাইসা) আল্লাহ্‌ ছাড়া প্রকাশ করার (কাশেফাতুন)।

৫৯. আফামিন হাজাল হাদিসে তাজাবূনা।
তোমরা কি এই কথা হইতে অবাক হইতেছ (তাজাবুনা)?

৬০. ওয়া তাদ্‌হাকুনা ওয়ালা তাব্‌কুনা।
এবং (তোমরা) কি হাসাহাসি করিতেছ (তাদ্‌হাকুনা)! এবং কান্নাকাটি করিবে না (তাবকুনা)।

৬১. ওয়া আনতুম সামেদুনা।
এবং তোমরা তো (সবাই) উদাসীন (সামেদুনা)

৬২. ফাসজুদু লিল্লাহে ওয়াবুদূ।
সুতরাং আল্লাহ্‌র জন্য সেজদা করো এবং এবাদত করো।

সূরা তোয়াহা
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১. তোয়াহা (ইহার অর্থ সিনার এলেমের অধিকারী ব্যক্তির নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়)।

২. আমরা নাজেল করি নাই কোরান আপনার উপর কষ্ট দিবার জন্য।
(মা আনজাল্‌না আলাইকাল্‌ কোরআনা লিতাশ্‌কা)।

৩. একমাত্র যাহারা ভয় করে (তাহাদের জন্য) উপদেশ।
(ইল্‌লা তাজ্‌কেরাতাল্‌ লিমাই ইয়াখ্‌শা)।

৪. একটি নাজেল তাঁহার (আল্লাহ্‌) হইতে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পৃথিবী এবং উঁচু আকাশসমূহ।
(তান্‌জিলাম্‌ মিম্‌ মান্‌ খালাকাল্‌ আর্‌দা ওয়াস্‌সামাওয়াতিল্‌ উলা)।

৫. রহমান (যিনি) আরশের উপরে বসিয়া আছেন।
(আর্‌ রাহমানু আলাল্‌ আর্‌শিস্‌ তাওয়া)।

৬. তাঁহারই জন্য আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে (আর্‌দ্‌ অর্থে মাটিকেও বোঝানো হয় এবং মানবদেহটিকেও বোঝানো হয়) এবং দুইয়ের মাঝখানে যাহা কিছু আছে এবং যাহা কিছু জমিনের নিচে আছে।
(লাহু মাফিশ্‌ সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল্‌ আর্‌দি ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়ামা তাহ্‌তাসারা)।

৭. এবং যদি আপনি উঁচু গলায় কথা বলেন সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি জানেন গোপন এবং গোপনের গোপন।
(ওয়া ইন্‌ তাজ্‌হার্‌ বিল্‌কাউলি ফাইন্‌নাহু ইয়ালামুস্‌ সির্‌রা ওয়া আখ্‌ফা)।

৮. তিনিই আল্লাহ্‌, নাই কোনো ইলাহ্‌ একমাত্র তিনি ছাড়া, তাঁহারই জন্য সুন্দর নামগুলি।
(আল্লাহু লা ইলাহা ইল্‌লাহু লাহুল্‌ আস্‌মাউল্‌ হুস্‌না)।

৯. এবং আপনার কাছে আসিয়াছে কি মুসার খবর?
(ওয়া হাল্‌ আতাকা হাদিসু মুসা)।

১০. যখন দেখিলেন আগুন (ইজ্‌ রাআ নারান্‌) সুতরাং বলিলেন তাঁহার আহালদেরকে (পরিবারবর্গকে) (ফাকালা লি আহ্‌লে) তোমরা অপেক্ষা করো, নিশ্চয়ই আমি আগুন দেখিয়াছি, হয়তো উহা হইতে আমি তোমাদের জন্য লইয়া আসিব জ্বলন্ত আগুনের কণা (কাবাসুন্‌)। অথবা পাইব আগুন হইতে কোনো পথপ্রদর্শক (হুদান্‌)।
(ইজ্‌ রাআ নারান্‌ ফাকালা লি আহ্‌লি ইম্‌ কুসু ইন্‌নি আনাস্‌তু নারাল্‌ লা আল্‌লি আতিকুম্‌ মিন্‌ হা বিকাবাসিন্‌ আওআজিদু আলান্‌নারি হুদান্‌)।

১১. সুতরাং যখন আসিলেন আগুনের নিকট, তখন ডাক দেওয়া হইল (নুদিয়া) (অদৃশ্য হইতে), হে মুসা।
(ফালাম্‌মা আতাহা নুদিয়া ইয়া মুসা)।

১২. নিঃসন্দেহে আমি আপনার রব (পালনকর্তা) সুতরাং আপনার জুতা দুইটি খুলিয়া ফেলুন। কেননা আপনি এখন তুয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় (ওয়াদিল) অবস্থান করিতেছেন।
(ইন্‌নি আনা রাব্‌বুকা ফাখ্‌লা নালাইকা। ইন্‌নাকা বিল্‌ ওয়াদিল্‌ মুকাদ্‌দাসি তুয়া)।

১৩. এবং আমি আপনাকে মনোনীত করিয়াছি সুতরাং শুনুন যাহা আপনার উপরে ওহি করা হইয়াছে।
(ওয়া আনাখ্‌ তার্‌তুগা ফাস্‌তামি লিমা ইউহা)।

১৪. নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ্‌, নাই কোনো ইলাহ (কর্তা, নেতা, অধিকারী, মাবুদ) একমাত্র আমিই, সুতরাং আমারই এবাদত করুন এবং সালাত কায়েম করুন জিকিরের (সংযোগ, যোগাযোগ) জন্য।
(ইন্‌নানি আনাল্লাহু লাইলাহা ইল্‌লা আনা ফাবুদুনি ওয়া আকিমুস্‌ সালাতা লি জিক্‌রি)।

১৫. নিশ্চয়ই সেই সময়টি আসিতেছে (সেই সংঘটন মুহূর্তটি) গোপন রাখিয়া দেই যাহাতে প্রত্যেক নফ্স (জীবাত্মা) পায় আপন আপন (নফ্সের) কর্মের ফল।

(ইন্না সাআতা আতিয়াতুন্ আকাদু উখ্ফিহা লিতুজ্জা কুল্লু নাফ্সিন্ বিমাতাস্আ)।

[সূরা তোয়াহার ১৫ নম্বর আয়াতটি গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে 'সাআত' শব্দটি দিয়ে একটি নফ্সের মৃত্যু-ঘটনার কথাটি পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যভাবে 'সাআত'-কেও কেয়ামত বলা চলে। কিন্তু কোরান-কেয়ামত শব্দটি ব্যবহার না করে 'সাআত' শব্দটি ব্যবহার করে প্রত্যেকটি নফ্সের কর্মফলগুলোকে গোপন রেখে আপন আপন নফ্সের কর্ম অনুযায়ী ফলটি দেবার কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই অর্জিত কর্মফলের চাকায় বারবার পিষ্ট হতে হতে নফ্স একদিন সব রকম জঞ্জাল ও ঝুটঝামেলা হতে মুক্তি পাবার আশাটি করতে পারে। আমার মনে হয়, এই রকমই একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটিকে গোপন রাখা হয়। কেউ যদি 'সাআত'-কে কেয়ামতও বলতে চান তাতেও আমাদের আপত্তি থাকে না। কিন্তু এখানে লক্ষ করার বিষয়টি হলো, কেবলমাত্র নফ্সের উপরেই 'সাআত'-এর কথাটি বলা হয়েছে। কোনো পাহাড়-পর্বত, কোনো নদী-নালা-সাগরের উপর 'সাআত' নামক ঘটনাটি ঘটে যাবার কথাটি কোরান-এর একটি স্থানেও আমরা পাই না। কেবলমাত্র প্রতিটি নফ্সের উপরে তথা জীবাত্মার উপরে 'সাআত'-এর ঘটনাটি ঘটে যাবার কথাটি কোরান স্পষ্ট ঘোষণা করছে]।

১৬. সুতরাং তোমার উপর ইমান আনে না, এবং অনুসরণ করে তাহার খেয়ালখুশিমতো, (হাওয়া হু) তাহা হইলে বিনাশ (ফাতার্দা) অবধারিত।

(ফালা ইয়া সুদ্দান্নাকা আন্হা মাল্লা উইমিনু বিহা ওয়াত্তারাআ হাওয়া হু ফাতার্দা)।

[(সাআতের উপরে) সুতরাং বিশ্বাস করতে পারে না বলেই যারা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো চলে তাদের বিনাশ যে অবধারিত এই কথাটি আমরা এই আয়াতে পাই। আপন খেয়ালখুশিমতো চলাটাই হলো ইসলামে একমাত্র অপরাধ। আর কোনো অপরাধ ইসলামে নাই বললেই চলে। কারণ খেয়ালখুশির সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থান আছে বলেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তথা বিনাশ হয়ে যাওয়ার সাবধান বাণীটি কোরান আমাদেরকে জানিয়ে দিল। খেয়ালখুশির সঙ্গেই খান্নাসরূপী শয়তান অবস্থান করে বলেই আল্লাহ্র দরবারে খেয়ালখুশিমতো চলাটিকে গুরুতর অপরাধ না বলে একমাত্র অপরাধ বলা হয়েছে এবং এই একমাত্র অপরাধের পরিণাম যে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া তথা বিনাশ হয়ে যাওয়া, সেই কথাটি কোরান প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিল। যদি খেয়ালখুশির সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থান না থাকত তা হলে আপন খেয়ালখুশিমতো না চলার জন্য কোরান সাবধান করে দিত না। কেবলমাত্র সাবধান করেই দেওয়া হলো না, বরং এই খেয়ালখুশিমতো চলা তথা এককথায় আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করাটি যে মহাঅপরাধ এবং পরিণামটিও যে একটি মহাধ্বংস সেই সতর্কবাণীটি আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো। আমরা জানি, সমস্ত রকম পাপপঙ্কিলতার জনকই হলো খান্নাসরূপী শয়তান নামক গুরুঠাকুর। কোরান-এর বহু আয়াতে শয়তানের অনুসরণ করতে তথা এত্তেবা করতে বারবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। কারণ জগতের যত রকম আকাম-কুকাম তথা অপকর্মগুলো এই খান্নাসরূপী শয়তান নামক গুরুঠাকুরই করিয়ে থাকে এবং এর পরিণামগুলো যে কত বড় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে প্রাচীন ইতিহাস হতে আজও এর ভয়ঙ্করতাটি মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। তাই কোরান বলছে, 'ফাতারদা' তথা তোমার ধ্বংস হয়ে যাবার পরিণতিটি অতি নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু বলতে হয় যে, যারা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো চলে তাদেরকে 'নফ্সে আম্মারা'-র অধিকারী বলা হয়েছে। 'আম্মারা' অর্থ হলো খান্নাসরূপী শয়তানযুক্ত নফ্স। এখানে নফ্স অপবিত্র নয়, বরং নফ্স পবিত্র; কিন্তু এই নফ্সের সঙ্গে যখন খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থানটি থাকে তখনই নফ্সটি কলুষিত হয়ে পড়ে। আমি এখানে বারবার নফ্স শব্দটি ব্যবহার করলাম, যদিও বাংলা ভাষায় এই নফ্সটিকে জীবাত্মা বলা হয়। জীবাত্মা মোটেই কোনো দোষণীয় ব্যাপার নহে। অনেকেই না-বুঝে না-শুনে জীবাত্মাটিকেই গালিগালাজ করে, কিন্তু জীবাত্মার সঙ্গে যখন খান্নাসরূপী শয়তানটির অবস্থান ঘটে তখনই জীবাত্মাটি কলুষিত হয়ে পড়ে এবং তখনই এই কলুষিত জীবাত্মাটি আপন খেয়ালখুশিমতো চলে এবং চলতে চায়। ইহাকেই আবার বাংলা ভাষায় অতি সংক্ষেপে 'আমিত্ব' বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় 'অহম'-ও বলা হয়। 'আমি' যোগ 'ত্ব' সমান সমান 'আমিত্ব'। এই 'ত্ব'-টিই হলো খান্নাসরূপী শয়তান। আমি একা, কিন্তু আমার সঙ্গে তথা আমার প্রাণের সঙ্গে তথা আমার নফ্সের সঙ্গে যখন 'ত্ব'-টি যোগ হয় তখনই বুঝতে হবে যে আমার নফ্সের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিও বহাল তবিয়তে অবস্থান করছে। অনেক মোটা বুদ্ধির জ্ঞানীজনেরা খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থানটিকে উল্লেখ না করে, বিশদ ব্যাখ্যা না দিয়ে 'আমি'-টাকেই ফেলে দেয়, তথা নফ্সটিকেই ফেলে দেয়, তথা নফ্সটাকেই ঘৃণা করতে শেখায়। ইহা নিঃসন্দেহে একটি জঘন্য ভুল। মারাত্মক ভ্রম। আমি তথা নফ্স কোনোদিন কোনোকালেও অপবিত্র নই এবং কোরান-এ একটি স্থানেও কেবলমাত্র নফ্সটির অবস্থানকে অপবিত্র, কলুষিত বলা হয় নাই। নফ্স একা, নিছক একা। আরবিতে এই নিছক একা নফ্সটিকে বলা হয় 'উদ্উনি'। যেইমাত্র একমাত্র নফ্সটির সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি যুক্ত হয়ে যায়, তখনই দুইজনের অবস্থানটি বোঝানো হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় 'উদউনা'। তাই আমরা কোরান-এর সূরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতে দেখতে পাই যে আল্লাহ জাল্লা শানাহু বলেছেন, 'আমাকে একা ডাকো, ডাকের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাবে।' যেহেতু আমার নফ্সটির সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি বহাল তবিয়তে অবস্থান করছে তাই আমি তথা আমার নফ্সটি মোটেই একা নয়, বরং দুইজন। দুইজনকে আরবি ভাষায় 'উদউনা' বলা হয়। এই দুইজনের অবস্থানটি থাকা অবস্থায় মেজাজি এবাদত-বন্দেগি অনেক করা যায়, কিন্তু ফলটি শূন্য। সমগ্র কোরান এই একটিমাত্র কথাটিকে বোঝাবার জন্য এত কথা, এত আদেশ, এত উপদেশ, এত সতর্কতা নামক আরও বহু বিশেষণে বান্দাকে সাবধান করে দিয়েছে। তিরিশ পারা কোরান-এ মাত্র একটি আদেশ, মাত্র একটি উপদেশ, আর সেই আদেশ ও উপদেশটি হলো: হে মানুষ, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়াতে তোমার সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছে। ইহাকে তাড়িয়ে দাও। তাড়াতে পারলেই

চঞ্চলতা, অস্থিরতা, অহংকার, গর্ব, ঠাটবাঁট, সব কিছুর অবসান হয়ে নফ্সটি এতমেনান লাভ করে। এই এতমেনান অর্জনকারী নফ্সটিকে জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিচ্ছে কোরান]।

১৭. এবং ওইটা কী তোমার ডান হাতে, (বিইয়ামিনিকা), হে মুসা?
(ওয়ামা তিল্কা বিইয়ামিনিকা ইয়া মুসা)।

১৮. তিনি বলিলেন, ইহা আমার লাঠি (আসাইয়া) ইহার উপরে আমি ভর দেই, এবং পাতা ঝারি, তাহা দিয়া, আমার ছাগলদের উপর (গানামি) এবং আমার আছে তাহার দ্বারা আরও প্রয়োজনগুলি।
(কালা হিয়া আসাইয়া আতাওয়াক্কাউ আলাইহা ওয়া আহুশ্শু বিহা আলা গানামি ওয়ালিয়া ফিহা মাআরিবু উখ্রা)।

১৯. (আল্লাহ্) বলিলেন, আপনি ইহা নিক্ষেপ করুন, হে মুসা।
(কালা আল কেহা ইয়া মুসা)।

২০. সুতরাং তিনি নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহা সাপ হইয়া চলিতে লাগিল।
(ফাআল্কাহা ফাইজা হিয়া হাইয়াতুন্ তাস্য়া)।

২১. (আল্লাহ্) বলিলেন (কালা) তাহা ধরুন (খুজ্হা) এবং ভয় করিবেন না (ওয়া লা তাকাফ্), উহাকে আমরা ফিরাইয়া দিব (সানুইদুহা) তাহার আগের অবস্থায় (সিরাতাহাল উলা)।

২২. এবং চাপাইয়া ধরুন (ওয়াদ্মুন) আপনার হাত (ইয়াদাকা) আপনার বগলের দিকে (ইলা জানাহিকা) বাহির হইবে (তাখ্রুজ) সাদা (বাইদোয়াআ) খুঁত ছাড়া (মিন্ গাইরি সুইন্) এবং আরেকটি দৃষ্টান্ত (আয়াতান উখ্রা)।

২৩. আপনাকে যেন আমরা দেখাই (লিনুরিইয়াকা) আমাদের বড় বড় (কুব্রা) নিদর্শন হইতে (মিন্ আয়াতিনাল্)
(লিনুরিইয়াকা মিন্ আয়াতিল্ কুব্রা)।

২৪. আপনি যান (ইজ্হাব্) ফেরাউনের দিকে (ইলা ফির্আউনা) নিশ্চয়ই সে (ইন্নাহু) সীমালঙ্ঘন করিয়াছে (তোয়াগা)।

২৫. (মুসা) বলিলেন (কালা) 'আমার রব (রাব্বি) প্রসারিত করুন (ইশ্রাহ্) আমার জন্য (লি) আমার বুক (সাদ্রি)।

২৬. এবং (ওয়া) সহজ করুন (ইয়াস্সির্) আমার জন্য (লি) আমার কাজ (আম্রি)।

২৭. এবং খুলিয়া দিন (ওয়াহ্লুল্) আমার তোতলামি (জড়তা) (উক্দাতাম্) আমার জিহ্বার (মিল্লিসানি)।

২৮. তাহারা বোঝে (ইয়াব্কাহু) আমার কথা (কাউলি)।

২৯. এবং বানাইয়া দাও (ওয়াজ্আল্) আমার জন্য (লি) একজন সাহায্যকারী (ওয়াজিরাম্) আমার পরিবারের মধ্য হইতে (মিন্ আহ্লি)।

৩০. হারুনকে (হারুনা) আমার ভাই (আখি)।

৩১. মজবুত (শক্ত, কঠিন) করুন (উশ্দুদ্) তাহাকে দিয়া (বিহি) আমার শক্তি (আজ্রি)।

৩২. এবং (ওয়া) তাহাকে শরিক করুন (আশ্রিক্হু) আমার কাজের মধ্যে (ফি আম্রি)।

৩৩. যেন (কাই) আমরা আপনার গুণকীর্তন করিতে পারি (নুসাব্বিহাকা) বেশি বেশি (কাশিরা)।

৩৪. এবং (ওয়া) আমরা আপনার জিকির করিতে পারি (নাজ্কুরুকা) বেশি বেশি (কাশিরা)।

৩৫. নিশ্চয়ই আপনি (ইন্নাকা) আছেন (কুন্তা) আমাদের উপর (বিনা) দর্শনকারী (বাসিরা)।

৩৬. বলিলেন (কালা) নিশ্চয়ই (কাদ্) আপনাকে দেওয়া হইল (উতিতা) আপনার চাওয়া (সুলাকা) হে মুসা (ইয়া মুসা)।

৩৭. এবং নিশ্চয়ই (ওয়া লাকাদ্) আমরা অনুগ্রহ করিয়াছিলাম (মানান্না) আপনার উপর (আলাইকা) একবার (মার্রাতান) আরও (উখ্রা)।

৩৮. যখন (ইজ্) আমরা ওহি করিয়াছিলাম (আওহাইনা) দিকে (ইলা) আপনার মাতার (উম্মিকা) যাহা ওহি করা হয় (মা উইহা)।

৩৯. যে (আনি) তাহাকে ফেলিয়া দেন (ইক্ জিফিহি) সিন্দুকের মধ্যে (ফিত্তাবুতি) সুতরাং তাহা নিক্ষেপ করুন (ফাত্জিফিহি) নদীর মধ্যে (ফিল্ ইয়াম্মি) সুতরাং তাহা ঠেলিয়া দিবে (ফাল্ ইউল্কিহি) নদী (ইয়াম্মু) তীরে (বিস্সাহিলি) তাহা তুলিয়া লইবে (ইয়া খুজুহু) আমার (আল্লাহ্) শত্রু (আদ্উল্লি) এবং তাহার (মুসা) শত্রু (ওয়া আদ্উল্লাহু) এবং আমি ঢালিয়া দিয়াছিলাম (ওয়া আল্ কাইতু) আপনার উপরে (আলাইকা) ভালোবাসা (মাহাব্বাতাম্) আমার পক্ষ হইতে (মিন্নি)। এবং আপনি যেন প্রতিপালিত হন (ওয়ালি তুস্না) আমার চোখের উপরে (সামনে) (আলা আইনি)।

৪০. যখন তোমার বোন চলিতেছিল সুতরাং বলিয়াছিল তোমাদের খবর দিব কি? উপরে তাহাকে কে লালন-পালন করিতে পারে? (ইজ্তাম্শি উখ্তুকা ফাতাকুলু হাল্ আদুল্লুকুম আলা মাই ইয়াক্ফুলুহু)। সুতরাং আপনাকে আমরা (আল্লাহ্) ফিরাইয়া দিলাম আপনার মায়ের দিকে (ফারাজানাকা ইলা উম্মিকা) তাহার চোখ যেন জুড়ায় (কাই তাকার্রা আইনুহা) এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত (দুঃখ) না হয় (ওয়ালা তাহ্জান) এবং আপনি হত্যা করিয়াছিলেন একটি নফ্স (এক ব্যক্তি) সুতরাং আপনাকে আমরা (আল্লাহ্) মুক্তি দিয়াছিলাম দুশ্চিন্তা হইতে (ওয়াকাতাল্তা নাফ্সান্ ফানাজ্জাইনাকা মিনাল্ গাম্বে) এবং (ওয়া) আপনাকে আমরা (আল্লাহ্) পরীক্ষা করিয়াছি (ফাতান্নাকা) পরীক্ষা (ফুতুনা) (ওয়া ফাতান্নাকা ফুতুনা) সুতরাং আপনি অবস্থান করিয়াছিলেন মাদায়েনের অধিবাসীদের মধ্যে বছর (সিনিনা) (ফালাবিস্তা সিনিনা ফি আহ্লে মাদ্ইয়ান)। তারপর আপনি আসিয়াছেন উপরে (আলা) নির্ধারিত সময়ে (কাদারিন) হে মুসা। (সুম্মা জিতা আলা কাদারি ইয়া মুসা)।

৪১. এবং আপনাকে আমি তৈরি করিয়াছি আমার নিজের জন্য (ওয়াস্তানাখ্তুকা লি নাফ্সি)।

[এই আয়াতটি হুবহু অনুবাদ করলাম সত্য, কিন্তু ইহার অর্থটি একদম বুঝতে পারলাম না। কারণ এই আয়াতে ইহাও প্রমাণিত হচ্ছে যে আল্লাহ্‌রও নফ্‌স আছে, অথচ আমরা জানি আল্লাহ্‌র নফ্‌স নাই। আমরা ইহাও জানি যে আল্লাহ্‌ রুহকে আদমের মধ্যে ফুৎকার করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র নফ্‌সকে ফুৎকার করেন নি। 'আমার নিজের জন্য' (লি নফ্‌সি) তথা 'আল্লাহ্‌র জন্য' কথাটি মোটেই বুঝতে পারলাম না। সুতরাং পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইলাম এ জন্য যে এই আয়াতের মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়াটা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। অবশ্য পরে অনেক লোগাত ঘাঁটাঘাঁটি করে জানতে পারলাম যে এই 'নিজের জন্য' (লি নাফ্‌সি) বলতে প্রাণটিকে বোঝানো হয় নি, বরং আল্লাহ্‌র জন্য বোঝানো হয়েছে। যদিও নফ্‌স শব্দটি আছে বলেই এই গোলকধাঁধায় পড়েছিলাম। আসলে নফ্‌স বলতে যে প্রাণ বোঝায় এখানে সেই অর্থে বোঝানো হয় নি, বরং বোঝানো হয়েছে শুধুমাত্র নিজের জন্য। কারণ নফ্‌সের বাংলা শব্দটি যদি প্রাণ অথবা জীবাত্মা হয় তা হলে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত করা যায় না। কারণ নফ্‌স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বেলায় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুতরাং 'লি নাফ্‌সি' বলতে এখানে আমার জন্য তথা আল্লাহ্‌র জন্য বোঝানো হয়েছে, যদিও শব্দটি একই রকম। আরবি ভাষাটি অত্যন্ত গরিব ভাষা তাই একটি শব্দের দ্বারা অনেক রকম অর্থ বোঝায়। যেমন 'দারবুন' শব্দটি দিয়ে পেটানো বোঝায় আবার আরও নিরানব্বই রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়]।

৪২. আপনি ও আপনার ভাই যান আমার (আল্লাহ্‌র) আয়াতসহ (নিদর্শনসহ) এবং আপনারা দুইজনে অলসতা করিবেন না আমার জিকিরের (স্মরণ, মনে করা) মধ্যে। (ইজ্‌হাব্‌ আন্‌তা ওয়া আখুকা বিআয়াতি ওয়ালা তানিয়া ফি জিক্‌রি)।

৪৩. দুইজনে যান ফেরাউনের দিকে, সে (ফেরাউন) নিশ্চয়ই সব রকম সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে (তথা) বিদ্রোহী (তোয়াগা)। (ইজ্‌হাবা ইলা ফির্‌আউনান্‌নাহু তোয়ারা)।

৪৪. সুতরাং তাহাকে (ফেরাউনকে) দুইজনে বলিবেন নম্রতার সহিত কথা। সে হয়তো উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে। (ফাকুলা লাহু কাউলাল্‌ লাইয়িনাল্‌ লা আল্লাহু এতাজাক্‌কারু আউ ইয়াখ্‌শা)।

৪৫. তাহারা দুইজনে বলিলেন, হে আমাদের রব (প্রতিপালক), নিশ্চয়ই আমরা ভয় করি যে, সে (ফেরাউন) বাড়াবাড়ি (দুর্ব্যবহার) করিবে (ইয়াফ্‌রুতা) আমাদের উপর অথবা সব রকম সীমা লঙ্ঘন করিবে।
(কালা রাব্‌বানা ইন্‌নানা নাখাফু আইইয়াফ্‌রুতা আলাইনা আউ আই ইয়াত্‌গা)।

৪৬. (আল্লাহ্‌) বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে (মাআকুমা) (আছি)। শুনি (আসমাউ) (আল্লাহ্‌) এবং দেখি (আরা)।
(কালা লা তাখাফা ইন্‌নানি মাআকুমা আসমাউ ওয়া আরা)।

৪৭. সুতরাং তাহার (ফেরাউন) কাছে দুইজনে যান সুতরাং দুইজনে বলুন, নিশ্চয়ই (আমরা) তোমার রবের দুইজন রসুল। সুতরাং পাঠাও আমাদের সাথে সুতরাং আমাদের সাথে বনী ইসরাইল(-কে) যাইতে দাও (প্রেরণ করো)।
(ফাতিআহু ফাকুলা ইন্‌না রাসুলা রাব্‌বিকা ফাআর্‌সিল মাআনা বানি ইসরাইল)।
এবং তাহাদেরকে উৎপীড়ন (নিপীড়ন) করিও না (ওয়া লা তোয়াজ্‌জিব্‌হুম)।
নিশ্চয়ই (কাদ্‌) তোমার (ফেরাউন) কাছে আমরা আসিয়াছি (জিনাকা) নিদর্শনসহ (বিআয়াতিম) তোমার রবের পক্ষ হইতে (মির্‌ রাব্‌বিকা)।
(কাদ্‌ জিনাকা বিআয়াতিম্‌ মির্‌ রাব্‌বিকা)।
এবং শান্তি (ওয়া সালামু) (তাহার) উপর যে অনুসরণ করে সঠিক পথের (হুদা)।
(ওয়া সালামু আলা মানিত্‌ তাবাআল হুদা)।

৪৮. নিশ্চয়ই নিশ্চয় (ইন্‌না কাদ্‌) ওহি করা হইয়াছে (উহিয়া) আমাদের দিকে (ইলাইনা) যে শাস্তি (এবং) যে মিথ্যা মনে করে (মান্‌ কাজ্‌জাবা) (তাহার) উপরে এবং মুখ ফিরাইয়া (লয়) (তাওয়াল্‌লা)।
(ইন্‌না কাদ্‌ উহিয়া ইলাইনা আন্‌নাল্‌ আজাবা আলা মান্‌ কাজ্‌জাবা ওয়া তাওয়াল্‌লা)।

৪৯. (ফেরাউন) বলিল, তাহা হইলে কে তোমাদের দুইজনের রব (রাব্‌বুকুমা), হে মুসা?
(কালা ফামার্‌ রাব্‌বুকুমা ইয়া মুসা)।

৫০. (মুসা) বলিলেন, আমাদের রব, যিনি দিয়াছেন (আতোয়া) প্রত্যেক জিনিসকে তাঁহার সৃষ্টি (খাল্‌কাহু) তারপর (সুম্‌মা) পথ দেখাইয়াছেন (হাদা)।
(কালা রাব্‌বুনাল্‌লাজি আতোয়া কুল্‌লা শাইয়িন, খাল্‌কাহু সুম্‌মা হাদা)।

৫১. (ফেরাউন) বলিল তাহা হইলে (পূর্বের শত শত বছরের) কওমদের (কুরুনিল) অবস্থা (বালুল) কী?
(কালা ফামা বালুল্‌ কুরুনিল্‌ উলা)।

৫২. (মুসা) বলিলেন তাঁহার জ্ঞান (ইলমুহা) আমার রবের (রাব্‌বি) নিকট (এন্‌দা) কেতাবের মধ্যে (আছে) আমার রব ভুল করেন না (লা ইয়া দিল্‌লু) এবং ভুলিয়া যান না (ওয়া লা ইয়ান্‌সা)।
(কালা ইল্‌মুহা এন্‌দা রাব্‌বি ফি কেতাবিন লা ইয়াদিল্‌লু রাব্‌বি ওয়া লা ইয়ান্‌সা)।

৫৩. যিনি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য জমিনকে (আর্‌দা : জমিন, পৃথিবী, মাটি, দেহ) বিছানা (মাহ্‌দান্ : গালিচা, কার্পেট) করিয়াছেন। এবং তোমাদের জন্য চালাইয়া দিয়াছেন (সালাকা) ইহার মধ্যে (ফিহা) রাস্তাসমূহ (সুবুলান) এবং আকাশ (সামাআ) হইতে পানি (মাআ) বর্ষণ করেন (আন্‌জালা)।
(আল্‌লাজি জাআলা লাকুমুল্ আর্‌দা মাহ্‌দাউ ওয়াসালাকা লাকুম্ ফিহা সুবুলাউ ওয়া আন্‌জালা মিনাস্ সামায়িমা)।
সুতরাং আমরা (আল্লাহ্) বাহির করিয়াছি (ফাখ্‌রাজ্‌না) তাহা দিয়া (বিহা) জোড়ায় জোড়ায় (আজ্‌ওয়াজান) বিভিন্ন (শাত্‌তা) উদ্ভিদ হইতে (মিন্‌নাবাতিন)।

৫৪. তোমরা খাও (কুলু) এবং তোমরা চড়াও (ওয়ারাও) তোমাদের গবাদিপশুগুলিকে (আনামাকুম)। নিশ্চয়ই (ইন্‌না) ওইটার (জালিকা) মধ্যে (ফি) (রহিয়াছে) নিদর্শনগুলি (লেআয়াতিন) বিবেকের (নুহা) অধিকারীদের জন্য (লিউলিন্)।
[এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো আর সেই বিষয়টি হলো বিবেকবানদের কথাটি এই আয়াতে বলা হয়েছে। এখানে ইমানদার, মোমিন, মুসলমান, মানুষ কাহারও নামটি উল্লেখ না করে বরং সার্বজনীনভাবে বলা হয়েছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যারা সত্যিই বিবেকবান তাদের কথাটি এখানে সার্বজনীনভাবে বলা হয়েছে]।

৫৫. তাহা হইতে (মিন্‌হা) আমরা সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদের (খালাক্‌নাকুম) এবং (ওয়া) ইহার মধ্যে (ফিহা) আমরা ফিরাইয়া দিব (নুইদু) তোমাদেরকে (কুম) এবং (ওয়া) ইহার মধ্য হইতে (মিন্‌হা) আমরা তোমাদেরকে বাহির করিব (নুখ্‌রিজুকুম্) আরও (উখ্‌রা) একবার (তারাতান্)।

৫৬. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (লাকাদ্) আমরা তাহাকে (ফেরাউনকে) দেখাইয়াছি (আরাইনাহু) আমাদের আয়াতসমূহ (আয়াতিনা) সমস্ত (কুল্‌লানা)। সুতরাং সে মিথ্যারোপ করিয়াছে (ফাকাজ্‌জাবা) এবং (ওয়া) অমান্য করিয়াছে (আবা : আরও অর্থ– অস্বীকার করা)।

৫৭. (ফেরাউন) বলিল (কালা) আমাদের কাছে আসিয়াছ কি (আজিতানা) আমাদের বাহির করার জন্যে (লেতুখ্‌রিজানা) আমাদের দেশ হইতে (মিন্ আর্‌দিনা) তোমার জাদু লইয়া (বেসিহ্‌রিকা) হে মুসা (ইয়া মুসা)।
[যদিও আর্‌দ অর্থ জমিন, মাটি, পৃথিবী, মানবদেহ, কিন্তু এখানে আর্‌দ বলতে দেশ শব্দটি ব্যবহার করলাম]।

৫৮. সুতরাং তোমার কাছে অবশ্যই আমরা আনিব (ফালানা তিয়ান্‌নাকা) জাদুকে (বিসিহিরিম্) তাহার অনুরূপ (মিস্‌লেহি) সুতরাং স্থির করো (ফাজ্‌আল্) আমাদের মাঝে (বাইনানা) এবং (ওয়া) তোমার মাঝে (বাইনাকা) নির্দিষ্ট সময় (মাওইদাল্) তাহা আমরা খেলাপ করিব না (লা নুক্‌লিফুহু) আমরা (নাহ্‌নু) এবং (ওয়া) তুমিও না (লা আন্‌তা) সমতল প্রান্তরে (মাকানান্ সুয়ান)।

৫৯. (মুসা) বলিলেন (কালা), তোমাদের নির্দিষ্ট সময় (মাওইদুকুম) উৎসবের দিন (ইয়াওমুজ্ জিনাতি) এবং (ওয়া) যে মানুষদেরকে সমবেত করা হইবে (আই ইউহ্‌শারান্ নাসা) সূর্য ওঠার সাথে (দোহান্)।

৬০. সুতরাং চলিয়া গেল (ফাতাওয়াল্‌লা) ফেরাউন (ফির্‌আউনু) সুতরাং জমা করিল (ফাজামা) কৌশলসমূহ (কাইদাহু) তারপর আসিল (সুম্‌মা আতা)।

৬১. মুসা তাহাদেরকে বলিলেন (কালা লাহুম মুসা), তোমাদের জন্য (রহিয়াছে) দুর্ভোগ (ওয়াইলাকুম) তোমরা আরোপ করিও না (লা তাফ্‌তারু) আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা (আলা আল্লাহে কাজিবান্) সুতরাং তোমাদের ধ্বংস করিয়া দিবেন (ফাইউস্‌ফিতাকুম্) আজাব দিয়া (বিআজাবিন)। এবং নিশ্চয়ই (ওয়া কাদ্) ব্যর্থ হইয়াছে (খাবা) যে মিথ্যা রচনা করিয়াছে (মানিফ্‌তারা)।

৬২. তারপর তাহারা মতবিরোধ করিল (ফাতানাজাউ) তাহাদের কাজে (আম্‌রাহুম) তাহাদের মধ্যে (বাইনাহুম) এবং গোপনে পরামর্শ করিল (ওয়া আসার্‌রুন নাজ্‌ওয়া)।

৬৩. তাহারা বলিল (কালু) নিশ্চয়ই এই দুইজন (ইন্‌হাজানি) অবশ্যই দুই জাদুকর (লাসাহিরানে) দুইজনে এরাদা করে (চায়) (ইউরিদানি) যে (আন্) দুইজন তোমাদেরকে বাহির করিয়া দিবে (ইউখ্‌রিজাকুম) তোমাদের ভূমি হইতে (মিন্ আর্‌দিকুম্) তাহাদের দুইজনের জাদুর সাহায্যে (বিসিহ্‌রি হিমা) এবং দুইজনে রহিত করিবে (ওয়া ইয়াজ্‌হাবা) তোমাদের জীবন-ব্যবস্থার (বিতারিকাতিকুম্) আদর্শ (মুস্‌লা)।

৬৪. সুতরাং তোমরা একত্রিত করো (ফাআজ্‌মিউ) তোমাদের কলাকৌশল (কাইদাকুম্) তারপর আসো (সুম্‌মাহ্‌তু) কাতারবন্দি হইয়া (সোয়াফ্‌ফান্) এবং নিশ্চয়ই আজ সফল হইবে (ওয়াকাদ্ আফ্‌লাহাল্ ইয়াওমা) যে প্রাধান্য বিস্তার করিবে (মানিস্‌তালা)।

৬৫. (জাদুকরেরা) বলিল, হে মুসা (কালু ইয়া মুসা), হয় নিক্ষেপ করো তুমি (ইম্‌মা আন্ তুলকি) এবং (না) হয় (ওয়া ইম্‌মা) আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করিব (আন্‌নাকুনা আউয়ালা মান্ আল্‌কা)।

৬৬. (মুসা) বলিলেন, বরং তোমরা নিক্ষেপ করো (কালা বাল্ আল্‌কু) সুতরাং তখন তাহাদের রশিগুলি (ফাইজা হিবালুহুম) এবং তাহাদের লাঠিগুলি (ওয়া ইউসিইউহুম) মনে হইল (ইউখাইইয়ালু) তাঁহার দিকে (দৌড়াইয়া আসিতেছে) (ইলাইহি) তাহাদের জাদু হইতে (মিন্ সিহিরি হিম্) তাহা যেন দৌড়াইতেছে (আন্‌নাহা তাস্‌আ)।

৬৭. সুতরাং অনুভব করিল (ফাআওজাসা) তাঁহার নফ্‌সের মধ্যে (ফি নাফ্‌সিহি) ভীতি (খিফাতান্) মুসা (মুসা)।

৬৮. আমরা (আল্লাহ্) বলিলাম (কুল্‌না), ভয় করিবেন না (লা তাকাফ্) নিশ্চয়ই আপনি (ইন্‌নাকা) আপনিই উপরে (আন্‌তাল্ আলা)।

৬৯. এবং নিক্ষেপ করুন (ওয়া আল্‌কি) আপনার ডান হাতের মধ্যে যাহা (আছে) (মা ফি ইয়ামিনিকা) গিলিয়া ফেলিবে (গ্রাস করিবে) (তাল্‌কাফ্) যাহা কিছু তাহারা বানাইয়াছে (মা সানাউ)। নিশ্চয়ই যাহা কিছু তাহারা বানাইয়াছে (ইন্‌নামা সানাউ) (উহা তো কেবলই) জাদুকরদের

কলাকৌশল (কাইদুস্ সাহেরিন) এবং জাদুকর (কখনই) সফল হয় না (ওয়া লা ইফ্লিহুস্ সাহেরু) যেখান থেকেই আসুক (না কেন) (হাইসু আতা)।

৭০. সুতরাং জাদুকরেরা সেজদায় পড়িয়া গেল (ফাউল্কিয়াস সাহারাতু সুজ্জাদান্)। তাহারা (জাদুকরেরা) বলিল (কালু) আমরা ইমান আনিলাম (আমান্না) রবের উপর (বেরাব্বি) হারুন এবং মুসার (হারুনা ওয়া মুসা)।

৭১. (ফেরাউন) বলিল (কালা), তোমরা ইমান আনিয়াছ (আমান্তুম্) তাহার উপর (লাহু) পূর্বেই (কাব্লা) যে (আন্) আমি অনুমতি দিবার (আজানা) তোমাদেরকে (লাকুম্)। নিশ্চয়ই সে (মুসা) তোমাদের প্রধান অবশ্যই (লা কাবিরুকুম্) যে (আল্লাজি) তোমাদেরকে শিখাইয়াছে (আল্লামাকুমুস্) জাদু (সেহ্রা)। সুতরাং অবশ্যই আমি (ফেরাউন) কাটিয়া দিব (ফালা উকাত্তিয়ান্ আন্না) তোমাদের হস্তগুলি (আইদিআকুম্) এবং (ওয়া) তোমাদের পদগুলি (আর্জুলাকুম্) বিপরীত দিক হইতে (মিন্ খিলাফিন্) এবং অবশ্যই তোমাদেরকে আমি শূলে চড়াইব (ওয়া লাউসাল্লিবান্নাকুম্) খেজুর গাছের কাণ্ডের মধ্যে (ফি খুজুইন্ নাখ্লি)। এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানিবেই (ওয়ালাতালামুন্না) আমাদের মধ্যে কে (দিতে পারে) (আইউনা) কঠিন (আশাদ্দু) আজাব (আজাবাউ) এবং দীর্ঘস্থায়ী (ওয়া আব্কা)।

৭২. তাহারা বলিয়াছিল (কালু), তোমাকে কখনোই শ্রেষ্ঠতা (প্রাধান্য) দিব না (লান্ নুশিরাকা) যাহা আমাদের কাছে আসিয়াছে (মা জাআনা) (উহার) উপর (আলা) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ হইতে (মিনাল্ বাইয়িনাতি) এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন (ওয়াল্লাজি ফাতারানা) সুতরাং তুমি তাহাই করো (ফাক্দি) যাহা কিছু (মা) তুমি (আন্তা) করিতে চাও (কাদিন্)। নিশ্চয়ই তুমি করিতে পারো (ইন্নামা তাক্দি) এই দুনিয়ার (পার্থিব) জীবনে (হাজিহিল্ হায়াতাদ্ দুনিয়া)।

৭৩. নিশ্চয়ই আমরা (ইন্না) ইমান আনিয়াছি (আমান্না) আমাদের রবের উপর (বিরাব্বিনা) তিনি যেন মাফ (ক্ষমা) করেন (লিইয়াগ্ফেরা) আমাদের (লানা) গুনাহ্গুলি (পাপ) (খাতাইয়ানা) এবং (ওয়া) যাহা (মা) আমাদেরকে বাধ্য করিয়াছ (আক্হার্তানা) জাদুর উপর হইতে (আলাইহি মিনাস্ সিহ্র)। এবং আল্লাহ্ উত্তম এবং স্থায়ী (ওয়াল্লাহু খাইরু ওয়া আব্কা)।

৭৪. তাই নিশ্চয়ই (ইন্নাহু) যে কেহ আসিবে (মাই ইয়াতি) তাহার রবের কাছে (রাব্বাহু) মুজ্রিম (অপরাধী) হইয়া (মুজরিমান্) সুতরাং নিশ্চয়ই (ফাইন্না) তাহার জন্য (লাহু) জাহান্নাম (দোজখ, নরক) (জাহান্নামা)। সে মরিবে না (লা ইয়া মুতু) তাহার মধ্যে (ফিহা) এবং বাঁচিবেও না (ওয়া লা ইয়াহ্ইয়া)।

['সে মরিবে না এবং বাঁচিবেও না' এই রকম জাহান্নামটির পরিচয় জানার পর কিছুটা অবাক হতে হয় বৈকি! যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইহা একটি আত্মবিরোধী কথা, কিন্তু আল্লাহ্র জন্য মোটেও ইহা আত্মবিরোধী নয়। প্রশ্ন আসতে পারে যে 'মরবেও না এবং বাঁচবেও না' এই কথাটির দ্বারা কী রকম একটি আজব পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে? কারণ মানুষ জানে যে, হয় মারা যাবে, না হয় জীবিত থাকবে, কিন্তু ইহার মাঝামাঝি অবস্থানটি যে নিঃসন্দেহে একটি ভয়ংকর অবস্থান ইহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। এই রকম অদ্ভুত অবস্থানটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় পদার্থ বিজ্ঞানী শ্রয়েডিঙ্গারের ভৌতিক বিড়ালের কথাটি। সে জগতে গতিবেগ আছে তো অবস্থান নাই, আবার অবস্থান আছে তো গতিবেগ নাই]।

৭৫. এবং যে তাঁহার (আল্লাহ্র) কাছে আসিবে (ওয়া মাইইয়াতি) মোমিন হইয়া (মুমিনান্) নিশ্চয়ই সে আমলে সালেহা করিয়াছে (কাদ্ আমেলাস্ সোয়ালেহাতি) সুতরাং ওইসব লোক (ফাউলাইকা) তাহাদের জন্য রহিয়াছে (লাহুমুদ) সর্বোচ্চ মর্যাদাসমূহ (দারাজাতুল উলা)।

[এখানে 'আমানু' তথা ইমানদার বলা হয় নি, বরং যারা ইমানদারের চেয়েও বহু ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন সেই মোমিনের কথা বলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, আমানু আর মোমিন কখনোই এক কথা নয়, কারণ আমানুর সঙ্গে আল্লাহ্ থাকেন না, কিন্তু মোমিনের সঙ্গে আল্লাহ্ থাকেন বা আছেন এই কথাটি কোরান-এর ৮ নম্বর সূরা আন্ফাল-এর ১৯ নম্বর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়া আন্নাল্লাহা মাআল্ মোমেনিনা' অধিকাংশ কোরান-এর অনুবাদক এবং তফসিরকারকেরা 'আমানু' এবং 'মোমিন'-কে মনের অজান্তে এক করে ডাইলে-চাউলে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেন। অবশ্য এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিও আল্লাহ্রই দান। সুতরাং বলার কিছুই থাকে না]।

৭৬. বসবাস (করবে) জান্নাতে (জান্নাতু আদ্নিন্) প্রবাহিত হয় (তাজ্রি) তাহার নিচ হইতে (মিন্ তাহ্তিহাল্) নহরসমূহ (নদী, জলধারা, খাল, নালা, স্রোতস্বিনী) (আন্হারু) ইহার মধ্যে (তাহারা) চিরকাল থাকিবে (খালেদিনা ফিহা) এবং ওইটাই পুরস্কার (ওয়া জালিকা জাজাউ) যে পবিত্র হইবে (মান্ তাজাক্কা)।

৭৭. এবং নিশ্চয়ই আমরা ওহি করিয়াছিলাম মুসার দিকে (ওয়া লাকাদ্ আওহাইনা ইলা মুসা) যে, আমার বান্দাদেরসহ রাতে যাত্রা করুন (আন্ আস্রি ইবাদি) সুতরাং বানান (ফাদ্রি) তাহাদের জন্য (লাহুম) পথ (তারিকান্) সাগরের মধ্যে (ফিল বাহ্রে) শুষ্ক (ইয়াবাসান্) ভয় করিবেন না (লা তাখাফু) ধরা পড়িবার (দারাকাওঁ) এবং ভয় করিবেন না (ওয়া লা তাখ্শা)।

৭৮. সুতরাং ফেরাউন তাহার সৈন্যবাহিনীসহ তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিল (ফাআত্বাআহুম্ ফির্আউনু বিজুনুদিহি) সুতরাং তাহাদেরকে ঢাকিয়া দিল (ফাগাশিইয়াহুম্) সাগর হইতে (মিনাল্ ইয়াম্মি) যাহা তাহাদেরকে নিমজ্জিত করিয়াছিল (মাগাশিয়াহুম্)।

৭৯. এবং ফেরাউন পথভ্রষ্ট করিয়াছিল তাহার কওমকে (জাতি) (ওয়া আদাল্লা ফেরআউনু কাউমাহু) এবং হেদায়েত করে নাই (ওয়া মা হাদা)।

৮০. হে ইসরাইলের সন্তানগণ (ইয়া বানি ইসরাইল), নিশ্চয়ই আমরা (আল্লাহ্) তোমাদেরকে উদ্ধার করিয়াছিলাম (কাদ্ আন্জাইনাকুম্) তোমাদের শত্রু হইতে (মিন্ আদুউইকুম্) এবং তোমাদেরকে আমরা সময় দিয়াছি (ওয়া ওয়াআদ্নাকুম্) তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে (জানিবাত্ তুরিল আইমানা) এবং আমরা নাজেল করিয়াছি (ওয়া নাজ্জাল্না) তোমাদের উপর (আলাইকুমুল) মান্না এবং সালোয়া (মান্না ওয়াস্সাল্ওয়া)।

৮১. তোমরা খাও (কুলু) পবিত্র জিনিসসমূহ (তাইয়েবাত) হইতে (মিন) যাহা (মা) তোমাদেরকে আমরা (আল্লাহ্) রেজেক দিয়াছি (রাজাক্নাকুম) এবং (ওয়া) বাড়াবাড়ি করিও না (লা তাদ্গাও) তাহার মধ্যে (ফিহি) সুতরাং পড়িবে (ফাইয়াহিল্লা) তোমাদের উপর (আলাইকুম) আমার গজব (ধ্বংস)(গাদাবি) এবং যাহার (উপরে) পড়িবে (ওয়া মাই ইয়াহিল) আমার গজব (গাদাবি) তাহার উপরে (আলাইহি) সুতরাং নিশ্চয়ই (ফাকাদ্) (সে) ধ্বংস হইয়া যাইবে (হাওয়া)।

৮২. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই আমি (ইন্নি) অবশ্যই ক্ষমাকারী (লা গাফ্ফারুল) (তাহার) জন্য যে (লিমান) তওবা করিল (তাবা)। এবং ইমান আনিল (ওয়া আমানা) এবং আমলে সালেহা (নেকির কাজ) করিল (ওয়া আমেলাস্ সোয়ালেহান্) তারপর সৎ পথে থাকে (সুম্মাহ্ তাদা)।

৮৩. এবং কীসে আপনাকে তাড়াহুড়া করাইল (ওয়া মা আহ্জালাকা) আপনার কওম (জাতি) হইতে (আন্ কওমিকা), হে মুসা (ইয়া মুসা)।

৮৪. (মুসা) বলিলেন (কালা), ওই তো তাহারা (হুম্ উলায়ি) উপরে (আলা॥ [বাক্যের সঙ্গে এই শব্দটির মিল পেলাম না অথবা ইহার অর্থ বুঝতে পারলাম না] আমার পিছনে (আসারি)। এবং আমি তাড়াতাড়ি করিয়াছি (ওয়া আজিল্তু) আপনার দিকে (ইলাইকা) হে আমার রব (রাব্বি), আপনি যেন খুশি হন (লিতার্দোয়া)।

৮৫. (আল্লাহ্) বলিলেন (কালা), সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা (আল্লাহ্) (ফাইন্না), পরীক্ষায় ফেলিয়াছি (ফাতান্না) নিশ্চয়ই (কাদ), আপনার কওমকে (কাওমাকা) আপনার পরে (মিম্ বাদিকা) এবং তাহাদেরকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে (ওয়া আদাল্লাহুমুস্) সামেরি (সামিরি)।

৮৬. সুতরাং ফিরিয়া আসিলেন মুসা (ফারাজা মুসা) তাহার কওমের দিকে (ইলা কওমিহি) গোস্বা হইয়া (রাগান্বিত হইয়া) (গাদ্বানা) (এবং) আফ্সোসকারী (আসিফান্)। (মুসা) বলিলেন (কালা), হে আমার কওম, (ইয়া কাওমি) তোমাদের কি ওয়াদা দেন নাই (আলাম ইয়াইদুকুম) তোমাদের রব (রাব্বুকুম) সুন্দর ওয়াদা (ওয়াদান্ হাসানা)? তবে কি লম্বা হইয়াছে (আফা তোয়ালা) তোমাদের উপর (আলাই-কুমুল) নির্ধারিত সময় (আহ্দু) অথবা (আম্) তোমরা চাহিয়াছ (আরাত্তুম) যে তোমাদের উপর গজব পড়িবে (আই ইয়াহিল্লা আলাইকুম গাদাবুন) তোমাদের রবের পক্ষ হইতে (মির্ রাব্বিকুম) সুতরাং তোমরা ভঙ্গ করিয়াছ (ফাআখ্লাফ্তুম) আমার সাথে ওয়াদা (মাও ইদি)।'

৮৭. তাহারা বলিল (কালু), 'আমরা ভঙ্গ করি নাই (মা আখ্লাফ্না) আমাদের ইচ্ছায় আপনার সাথে ওয়াদা (মাওইদাকা বেমাল্কিনা) কিন্তু (ওয়ালাকিন্না) আমাদের উপর বোঝাগুলি চাপানো হইয়াছিল (হুম্মিল্না আওজারাম) কওমের অলঙ্কার হইতে (মিন্ জিনাতিল্ কাওমি) সুতরাং আমরা নিক্ষেপ করি' (ফাকাজাফ্নাহা), সুতরাং ওইরূপে (ফাকাজালিকা) নিক্ষেপ করিল (আল্কাস) সামেরিও (সামেরি)।

৮৮. সুতরাং বাহির করিল (ফাআখ্রাজা) তাহাদের জন্য (লাহুম) একটি বাছুরের (ইজলান্) আকৃতি (জাসাদাল্) তাহার মধ্যে (লাহু) হাম্বা ডাক (খুআরুন) (ছিল) সুতরাং তাহারা বলিল (ফাকালু) এইটা (হাজা) তোমাদের ইলাহ্ (খোদা) (ইলাহুকুম) এবং মুসারও ইলাহ্ (ইলাহু মুসা), সুতরাং (মুসা) ভুলিয়া গিয়াছিল (ফানাসিয়া)।

৮৯. সুতরাং তাহারা দেখে নাই কি (আফালা ইয়ারাওনা) তাহাদের দিকে (ইলাইহিম্) কথার (কাওলান্) (উত্তর দেয় না) ফিরিয়াও আসে না যে (আল্লা ইয়ার্জিউ) এবং ক্ষমতা রাখে না (ওয়া লা ইয়াম্লিকু) তাহাদের (লাহুম) ক্ষতি (দর্বাউ) এবং না উপকার (ওয়া লা নাফান্)।

৯০. এবং নিশ্চয়ই (ওয়া লাকাদ্) হারুন তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন (কালা লাহুম হারুনু) পূর্বেই (মিন্ কাব্লু), নিশ্চয়ই তাহার দ্বারা তোমাদের ফেত্নায় ফেলা হইয়াছে (পুতিন্তুম্বিহি) এবং তোমাদের রব নিশ্চয়ই রহমান (দয়ালু) (ওয়া ইন্না রাব্বাকুমুর্ রাহ্মান) আমার আদেশের তোমরা আনুগত্য করো এবং সুতরাং তোমরা আমাকে অনুসরণ করো (ফাত্তাবিউনি ওয়া আতিউ আম্রি)।

৯১. তাহারা বলিয়াছিল (কালু), 'কখনোই না (লান্) আমরা বিরত হইব (নাব্রাহা) কাহার কাছে (আলাইহি) লাগিয়া থাকিব (বাছুর পূজা করা হইতে) (আখিফিনা) যতক্ষণ না (হাত্তা) ফিরিয়া আসিবে (ইয়ার্জিয়া) আমাদের নিকটে (ইলাইনা) মুসা (মুসা)।'

৯২. (মুসা) বলিলেন (কালা), 'হে হারুন (ইয়া হারুনু), কিসে (মা) তোমাকে বারণ করিল (মানাকা) যখন (ইজ) তাহাদেরকে তুমি দেখিলে (রাআইতাহুম) পথভ্রষ্ট হইয়াছে (গোমরা হইয়াছে) (দোয়াল্লু)।

৯৩. 'আমার (আদেশের) অনুসরণ করিলে না যে (আল্লা তাত্তাবিয়ানি) তুমি কি তবে অমান্য করিয়াছ (আফাআসাইতা) আমার হুকুম (আম্রি)?'

৯৪. তিনি (হারুন) বলিলেন (কালা), 'হে আমার মায়ের ছেলে (ভাই) (ইয়াব্না উম্মা) আমার দাড়ি ধরিবেন না (লা তাখুজ্ বিলিহ্ইয়াতি) এবং না আমার মাথার (চুল) (ওয়া লা বিরাসি) নিশ্চয়ই আমি (ইন্নি) আশংকা করিয়াছি (খাশিতু) যে আপনি বলিবেন (আন্তাকুলা) তুমি ফারাক করিয়াছ (বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ) (ফার্রাক্তা) মধ্যে (বাইনা) ইসরাইলের সন্তানদের (বনি ইসরাইলা) এবং তুমি দাম দেও নাই আমার কথায় (ওয়া লাম্ তার্কুব্ কাউলি)।'

৯৫. (মুসা) বলিলেন (কালা), 'তাহা হইলে তোমার ব্যাপার কী, হে সামেরি (হামা খাদ্বুকা ইয়া সামেরিউ) ?'

৯৬. (সামেরি) বলিল (কালা), 'আমি দেখিয়াছি (বাসুতু) ওই বিষয়ে যাহা (বিমা) তাহারা দেখে নাই (লাম্ ইয়াফ্সুরু) সেই সম্পর্কে (বিহি) সুতরাং আমি মুষ্টিতে লইয়াছি (ফাকাবাত্তু) এক মুষ্টি (কাব্দোয়াতান্) রসুলের পদচিহ্ন হইতে (মিন্ আসারিল রাসুলি)। সুতরাং তাহা আমি নিক্ষেপ করিয়াছি (ফানাবাস্তুহা) এবং (ওয়া) ওই রূপেই (কাজালিকা) জাগরিত করিয়াছিল (সাউয়ারাত) আমার নফ্সের জন্য (লি নাফ্সি)।'

৯৭. (মুসা) বলিলেন (কালা), 'সুতরাং তুমি যাও (ফাজ্হাব্) নিশ্চয়ই এখন (ফাইন্না) তোমার জন্য (লাকা) জীবনের মধ্যে আছে (ফিল্ হায়াতি) যে তুমি বলিবে (আন্তাকুলা) (আমাকে) স্পর্শ করিবে না (লা মেসাসা)। এবং নিশ্চয়ই (আছে) তোমার জন্য (ওয়া ইন্না লাকা) নির্দিষ্ট সময় (মাওইদাল্) কখনোই ইহার ব্যতিক্রম করা হইবে না (লান্ তোখ্লাফাহু)। এবং দেখো তোমার ইলার দিকে (ওয়া উন্জুর ইলাহিকাল্) যাহা

তাহার কাছে তুমি হইয়াছিলে পূজারি (আল্লাজি জাল্তা আলাইহি আকিফান)। নিশ্চয়ই আমরাই জ্বালাইব উহাকে (লানুহার্‌রিকান্নাহু) ইহার পর তাহাকে আমরা নিশ্চয়ই এলোমেলোভাবে ছড়াইব (সুম্মা লানান্‌সিফান্নাহু) নদীর মধ্যে (ফিল্ ইয়াম্‌মে) এলোমেলো করিয়া (নাস্‌ফান্)।

৯৮. তোমাদের ইলাহ কেবলই আল্লাহ্ (ইন্‌নামা ইলাহ্ হুকুমউল্লাহ্), যিনি (আল্লাজি) নাই (লা) কোনো ইলাহ্ (ইলাহা) তিনি ছাড়া (ইল্লাহু)। সব কিছু পরিবেষ্টিত (আল্লাহ্‌র) জ্ঞানে (ওয়াসিয়া কুল্লু শাইয়িন ইল্‌মান্)।

৯৯. ওই রূপে (কাজালিকা) বর্ণনা করিয়াছি আমরা (নাকুস্‌সু) তোমাদের কাছে (আলাইকা) খবরসমূহ (খবরাদি) হইতে (মিন্ আম্‌বায়ি) যাহা নিশ্চয়ই অতীত হইয়াছে (মা কাদ্ সাবাকা)। এবং নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে দিয়াছি (ওয়া কাদ্ আতাইনাকা) আমাদের নিকট হইতে (মিল্‌লাদুন্‌না) জিকির (উপদেশ) (জিক্‌রান্)।

১০০. যে কেহ মুখ ফিরাইবে (মান্ আরাদা) তাহা হইতে (আন্‌হু) সুতরাং নিশ্চয়ই সে (ফাইন্‌নাহু) সুতরাং নিশ্চয়ই সে (ফাইন্‌নাহু) বহন করিবে (ইয়াহ্‌মেলু) কেয়ামতের দিনে (ইয়াওমাল কেয়ামাতি) বোঝা (উইজরান্)।

১০১. বাস করিবে (খালিদিনা) ইহার মধ্যে (ফিহি) এবং তাহাদের জন্য কত মন্দ (ওয়া সায়ালাহুম) কেয়ামতের দিনে (ইয়াওমাল্ কেয়ামাতি) বোঝা (হিমলান)।

১০২. যেই দিন (ইয়াওমা) ফুঁ দেওয়া হইবে (ইউন্‌ফাকু) সিঙ্গার মধ্যে (ফিস্‌সুরি) এবং আমরা (আল্লাহ্) সমবেত করিব মুজরিম (অপরাধী)-দেরকে (ওয়া নাহ্‌শুরুল মুজ্‌রিমিনা) ঝাপসা দৃষ্টিওয়ালা অবস্থায় সেই দিন (ইয়াওমাইদিন জুর্‌কান)।

১০৩. তাহারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলিবে (ইয়াতাখাফাতুনা বাইনাহুম), না তোমরা অবস্থান করিয়াছিলে (ইল্‌লা বিস্‌তুম) কেবলমাত্র (ইল্‌লা) দশ (দিন) (আশ্‌রান্)।

১০৪. আমরা ভালো জানি (নাহ্‌নু আলামু) ওই বিষয়ে যাহা তাহারা বলিবে (বিমা ইয়াকুলুনা), যখন বলিবে (ইজ ইয়াকুলু) তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম ব্যক্তিই (আম্‌শালুহুম), বুদ্ধিমত্তায় (তারিকাতান্) না তোমরা অবস্থান করিয়াছিলে (ইল্‌লা বিশ্‌তুম) একমাত্র একদিন (ইল্‌লা ইয়াওমান্)।

১০৫. এবং আপনাকে তাহারা প্রশ্ন করে (ওয়া ইয়াস্‌আলুনাকা) পর্বতসমূহ সম্পর্কে (আনিল্ জিবালি) সুতরাং বলুন তাহা উড়াইয়া দিবেন ধুলা করিয়া (ফাকুল্ ইয়ান্‌সিফুহা) আমার রব উড়াইয়া দিতে পারেন (রাব্‌বি নাস্‌ফান্)।

১০৬. সুতরাং তাহা পরিণত করিবেন (ফাইয়া জারুহা) সমতল (কাআন্) রুক্ষ-ধূসর মাঠে (সফ্‌সফান্)।

১০৭. তুমি দেখিবে না (লা তারা) ইহার মধ্যে (ফি হা) বক্রতা (ইউয়াজাউ) এবং না অসমান (ওয়া লা আম্‌তান্)।

১০৮. সেই দিন তাহারা অনুসরণ করিবে (ইয়াওমাইদি ইয়াত্তাবিউনাদ্) এক আহ্বানকারীকে (দাইয়াহ্) না (থাকিবে) তাহার বক্রতা (লা ইউয়াজা লাহু) এবং আওয়াজসমূহ ক্ষীণ হইবে (ওয়া খাশাআতিল্ আস্‌ওয়াতু) রহমানের জন্য (লির্ রাহ্‌মানি), সুতরাং তুমি শুনিবে না (ফালাতাস্‌মাউ) একমাত্র মৃদু শব্দ (ছাড়া) (ইল্‌লা হাম্‌সান্)।

১০৯. সেই দিন (ইয়াওমাইজিল্) উপকার দিবে না (লা তান্‌ফাউশ্) সুপারিশ (শাফায়াতু), একমাত্র যাহাকে (ইল্‌লা মান্) অনুমতি দিবেন (আজিনা) তাহার জন্য (লাহুর) রহমান (রাহ্‌মান)। এবং রাজি হইবেন তাহার কথায় (ওয়া রাদিয়া লাহু কাওলান্)।

১১০. তিনি জানেন (ইয়ালামু) যাহা কিছু তাহাদের সামনে (আছে) (মা বাইনা আইদিহিম), এবং যাহা কিছু তাহাদের পিছনে (আছে) (ওয়া মা খাল্‌ফাহু) এবং ইহাকে তাহারা জ্ঞান (দিয়া) আয়ত্ত করিতে পারে না (ওয়া লা ইউহিতুনা বিহি ইল্‌মান্)।

১১১. এবং অবনত করা হইবে (ওয়া আনাতিল্) চেহারাগুলি (মুখমণ্ডল) (উজুহু) অক্ষয় (চিরস্থায়ী) (এবং) অমরের (চিরঞ্জীব) কাছে (লিল্ হাইয়িল কাইউম)। এবং নিশ্চয়ই বিফল (ব্যর্থ) হইবে (ওয়া কাদ্ খাবা) যে বহন করিবে জুলুম (মান্ হামালা জুল্‌মান্)।

১১২. এবং যে আমল করিবে সালেহা (নেকি) হইতে (ওয়ামাই ইয়ামাল্ মিনাস্‌সোয়ালিহাতি) এবং সে মোমিন (ওয়া হুয়া মুমিনুন্) সুতরাং ভয় নাই (ফালা ইয়াখাফু) জুলুমের (জুলমান্) এবং না ক্ষতি (ওয়া লা হাদ্‌মান্)।

[বিশেষ করে মানুষের হক নষ্ট করার বেলায় এই 'হাদমান' শব্দটি তথা ক্ষতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কারণ মানুষের হক নষ্ট করলে আল্লাহ্ ক্ষমা করার কোনো আইন রাখেন নি এবং বান্দার এই হক নষ্ট করার দরুনই অধিকাংশ মানুষ নিরাশ হবে তথা জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাবে। অথচ অধিকাংশ মানুষ ইহা বুঝেও বুঝতে চায় না]।

১১৩. এবং ওইরূপে আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি (ওয়া কাজালিকা আন্‌জাল্‌নাহু) কোরান-কে আরবিতে (কোরানান আরাবিয়ান)। এবং আমরা বিস্তারিত (বিশদভাবে) বর্ণনা করিয়াছি ইহার মধ্যে (ওয়া সার্‌রাফ্‌না ফিহি) সতর্কবাণী হইতে (মিনাল্ ওয়াইদি) যাহাতে তাহারা (লাআল্‌লাহুম) তাক্‌ওয়া গ্রহণ (অবলম্বন) করে (ইয়াত্‌তাকুনা) অথবা সৃষ্টি করিবে (আও ইউহ্‌দিসু) তাহাদের জন্য জিকির (লাহুম্ জিকরান্)।

[এখানে ভালো করে লক্ষ করে দেখুন যে কোরান-কে আরবি ভাষায় নাজেল করার কথাটি বলা হয়েছে। যেহেতু হাকিকি কোরান কালি-কলম-কাগজ আর ছাপার অক্ষরে অবস্থান করে না, বরং হাকিকি কোরান হলো আল্লাহ্‌র জাতনূর। কাগজ-কালিতে যে নূরি কোরান-টি ছাপার অক্ষরে দেখতে পাই ইহা হলো মেজাজি কোরান। এই মেজাজি কোরান-কে সবাই স্পর্শ করতে পারে, কিন্তু হাকিকি কোরান-কে পবিত্র না হয়ে স্পর্শ করার কোনো ক্ষমতাই নাই। (লা ইয়া মাস্‌সাহু ইল্‌লাল্ মুত্‌তাহারুন)। ক্যামেরায় বাঘ-সিংহের ছবি তোলাটি দেখলে যেমন সবাই বাঘ আর সিংহই বলবে, কিন্তু ইহা হলো মেজাজি বাঘ-সিংহ। হাকিকি বাঘ-সিংহ দেখতে চাইলে চিড়িয়াখানায় যাওয়া ছাড়া অসম্ভব। সেই রকম হাকিকি কোরান-এর সন্ধান যদি কেউ করার ইচ্ছা পোষণ করে তা হলে তাকে জাবালুন নূর পর্বতের হেরাগুহার মতো নির্জন স্থানে কমপক্ষে দশ-

পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করতে হবে। অন্যথায় কতগুলো সুন্দর সুন্দর কথা জানতে পারা যায় এবং সেই কথা দিয়ে চমকিয়ে দেওয়া যায়, সেই কথা দিয়ে জব্দ করা যায়, কিন্তু নূরি কোরান-এর প্রশ্নে একদম অজ্ঞান। ইমাম গাজ্জালির পীর আবু আলি ফারমাদি ইমাম গাজ্জালিকে বলেছিলেন এই বলে যে, তুমি কালি-কলম দিয়ে ঘষে ঘষে অনেক কাগজ নষ্ট করেছ আর আমি আমার কলবের উপর আল্লাহ্‌র জিকির দিয়ে একটানা বছরের পর বছর ঘষেছি। তবে ইহা অপ্রিয় হলেও একদম সত্য কথা যে কালি-কলম কাগজের উপর ছাপানো কোরান, যাকে আমরা মেজাজি কোরান বলি, ইহার গুরুত্ব হাকিকি কোরান হতে অনেক অনেক বেশি। চিড়িয়াখানায় গিয়ে হাকিকি বাঘ আর সিংহ দেখার সৌভাগ্যটি সবার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, কিন্তু ছবির বাঘ আর সিংহটি সবাই দেখতে পারে এবং বাঘ-সিংহের ওপর একটি মোটামুটি ধারণা জন্মে। কোরান-কে আরবি কোরান বলা হয়েছে। তা হলে কি ইঞ্জিল, জাবুর ও তাওরাত-কেও নূরি কোরান বলা যায় না? বলা যায় না কি আরও নাম-না-জানা ১০৪টি নাজেল করা কেতাবগুলোকে?]

১১৪. সুতরাং আল্লাহ্ মহান (ফাতাআলাল্লাহু) সত্যিকার মালিক (মালিকুল্ হাক্কু) এবং তাড়াহুড়া করিবেন না (ওয়া লা তাজ্‌আল্) কোরান-এর জন্য (বিল্ কোরআনি) পূর্ব হইতে (মিন কাব্‌লি) যাহা সম্পূর্ণ করা হয় (আই ইউক্‌দা) আপনার দিকে (ইলাইকা) তাহার ওহি (ওয়াহ্‌ইউহু) এবং বলুন (ওয়া কুর্) হে আমার রব (রাব্‌বি) আমাকে অধিক দাও (জিদ্‌নি) জ্ঞান (ইল্‌মান্)।

১১৫. এবং নিশ্চয়ই আমরা (আল্লাহ্) নির্দেশ দিয়াছিলাম (ওয়া লাকাদ্ আহিদ্‌না) আদমের দিকে (ইলা আদামা) পূর্ব হইতে (মিন্ কাব্‌লু) সুতরাং তিনি কিন্তু ভুলিয়া যান (ফানাসিয়া) এবং আমরা পাই নাই (ওয়া লাম্ নাজিদ্) তাহার মধ্যে (লাহু) দৃঢ়তা (শক্ত, অটল, মজবুত) (আজ্‌মান)।

১১৬. এবং যখন আমরা (আল্লাহ্) বলিয়াছিলাম (ওয়া ইজ কুল্‌না) ফেরেশতাদেরকে (লিল্ মালাইকাতিস্) তোমরা সেজদা করো (যদু) আদমের জন্য (লি আদামা) সুতরাং তাহারা সেজদা করিল (ফাসাজাদু) একমাত্র ইবলিস (করিল না) (ইল্‌লা ইবলিস)। সে অমান্য করিল (আবা)।

[ইবলিস জিনজাতিরই একজন। মনে রাখতে হবে যে মানবজাতি এবং জিনজাতিকেই সামান্য স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দান করা হয়েছে। আর কোনো সৃষ্টিজীবকেই আল্লাহ্‌পাক এই নির্দিষ্ট স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দান করেন নি। যেহেতু ইবলিসের সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দেওয়া হয়েছে সেই হেতু ইবলিস তার ভালো-মন্দ বিচার করার অধিকারটি পেয়েছিল। আর তাই ইবলিস আদমকে সেজদা দিতে অস্বীকার করল। কিন্তু ফেরেশতাদেরকে কোনো প্রকার স্বাধীনতা দেওয়াই হয় নি। তাই ফেরেশতারা আদমকে সেজদা করবেই, কারণ আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার অধিকারটি ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয় নি, এখানে অবাক হবার কিছুই নাই। কারণ ফেরেশতাদের আল্লাহ্‌র কোনো হুকুম অমান্য করার প্রশ্নই ওঠে না। আরও মনে রাখতে হবে যে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌পাক কোনো নফ্‌স এবং কোনো রুহ দান করেন নি। সুতরাং এককথায় বলতে গেলে ফেরেশতারা হলো আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ]।

১১৭. সুতরাং আমরা (আল্লাহ) বলিলাম (ফাকুল্‌না,) হে আদম (ইয়া আদামু), নিশ্চয়ই এইটা আপনার জন্য শত্রু (ইন্‌না হাজা আদুউল্ লাকা) এবং আপনার স্ত্রীর জন্য (ওয়া লিজাউজিকা) সুতরাং আপনাদের দুইজনকে যেন বাহির করিয়া না দেয় (ফালা ইউখ্‌রিজান্‌নাকুমা) জান্নাত হইতে (মিনাল্ জান্‌নাতি) সুতরাং আপনি কষ্টে পড়িবেন (ফাতাশ্‌কা)।

১১৮. নিশ্চয়ই আপনার জন্যে (ইন্‌না লাকা) তাহার মধ্যে (জান্নাত) আপনি ক্ষুধার্ত হইবেন না (আল্‌লা তাজুয়া ফিহা) এবং আপনি উলঙ্গ হইবেন না (ওয়া লা তায়ারা)।

১১৯. এবং আপনি ইহার মধ্যে পিপাসার্ত হইবেন না (ওয়া আন্‌নাকা লা তাজ্‌মাউ ফিহা) এবং রৌদ্রতপ্ত হইবেন না (ওয়ালা তাদ্‌হা)।

১২০. সুতরাং ওয়াস্‌ওয়াসা (কুমন্ত্রণা) দিল শয়তান তাহাকে (ফাওয়াস্‌ওয়াসা ইলাইহিস্ শায়তোয়ানু) সে (শয়তান) বলিল, 'হে আদম, (কালা ইয়া আদামু), আমি (শয়তান) কি তোমাকে বলিয়া দিব (হাল্ আদুল্‌লুকা) চিরন্তন জীবনের এই গাছের (বৃক্ষ) উপরে (আলা শাহ্‌জারাতিল্ খুল্‌তি) এবং অবিনশ্বর রাজত্বের ক্ষয় হয় না (যাহা) (ওয়া মুল্‌কিল্ লা ইয়াব্‌লা)।'

১২১. সুতরাং দুইজনে খাইলেন (ফাআকালা) উহা হইতে (মিন্‌হা) সুতরাং প্রকাশ হইল (আবাদাত) দুইজনের কাছে (লাহুমা) দুইজনের লজ্জাস্থান (সাওয়াতুহুমা) এবং দুইজনে শুরু করিলেন (ওয়া তোয়াফিকা) দুইজনে ঢাকিতে (ইয়াখ্‌সিফানি) দুইজনের উপর (আলাইহিমা) পাতা হইতে (মিউ ওয়ারাকিল্) জান্নাতে (জান্‌নাতি) এবং অমান্য করিলেন আদম (ওয়া আসা আদামু) তাঁহার রবকে (রাব্‌বাহু) সুতরাং তিনি ভ্রমে (পতিত) হইলেন (ফাগাওয়া)।

[বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির পীর হজরত বাবা শামসে তাব্রিজ অবশ্য এই বিষয়টিতে অন্যরকম কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, সত্যদ্রষ্টা আদমের ভেতর নুরে মোহাম্মদি রূপে স্বয়ং আল্লাহ্, যেখানে মওজুদ আছেন সেখানে বিভ্রান্ত হবার প্রশ্নই আসে না, বরং হজরত আদম (আঃ) জেনেশুনে ইচ্ছা করে খাইলেন। তিনি জানতেন যে যদি উহা ভক্ষণ না করি তাহা হইলে আল্লাহর সৌন্দর্য একটি স্থানে এসে স্থবির হয়ে দণ্ডায়মান হয়। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে হজরত আদম (আঃ)-কে যদিও দোষী সাব্যস্ত করতে হয়, কিন্তু তিনি মোটেই কোনো দোষের কাজ করেন নি। যাহা কিছু করেছেন উহা জেনেশুনেই করেছেন এবং জেনেশুনে করাটিকে অন্যায় না বলে আদা বলাই ভালো। কারণ প্রত্যেক নবি মাসুম। গুনাহ্ করাটা অসম্ভব। কোনো নবিই গুনাহ্ করতে আসেন নি, বরং তাদের উম্মতদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য ইচ্ছাকৃত ভুল (?) করেছেন। ইহাই আহ্‌লে সুন্নাতুল জামাতের আকিদা]।

১২২. ইহার পরে (সুম্‌মাজ) তাঁহাকে (আদমকে) বাছাই করিলেন তাঁহার রব (ইস্‌তাবাহু রাব্‌বাহু) সুতরাং মাফ (ক্ষমা) করিলেন (ফাতাবা) তাহাকে (আলাইহি) এবং রাস্তা দেখাইলেন (ওয়া হাদা)।

১২৩. (আল্লাহ্) বলিলেন (কালাহ্), দুইজনে নামিয়া যাও (বিতা) ইহা হইতে (মিন্হা) একসাথে (জামিয়াম) তোমরা একে-অপরের জন্য শত্রু (বাদুকুম্ লিবাদিল আদুবুন)। সুতরাং যখন (ফাইম্মা) তোমাদের কাছে আসিবে (ইয়াতিয়ান্নাকুম্) আমার হইতে (মিন্নি) হেদায়েত (হুদান্)। সুতরাং যে অনুসরণ করিবে (ফামানিত্তাবা) আমার হেদায়েত (হুদাইয়া) সুতরাং বিভ্রান্ত হইবে না (ফালা ইয়াদিল্লু) এবং কষ্ট পাইবে না (ওয়া লা ইয়াশ্কা)।

১২৪. এবং যে (ওয়া মান্) বিমুখ হইবে (আহ্লাদা) আমার জিকির হইতে (আন্ জিক্রি) সুতরাং নিশ্চয় (ফাইন্না) তাহার জন্য (লাহু) জীবনযাপন (মাইশাতান্) সংকুচিত (দান্কাউ) এবং আমরা তাহাকে উঠাইব (ওয়া নাহ্শুরুহু) কেয়ামতের দিনে (ইয়াওমাল্ কেয়ামাতি) অন্ধ অবস্থায় (আমা)।

১২৫. সে বলিবে (কালা), হে আমার রব (রাব্বি), কেন (লিমা) আমাকে উঠাইলেন (হাশার্তানি) অন্ধ অবস্থায় (আমা) এবং নিশ্চয়ই (ওয়া কাদ্) আমি ছিলাম (কুন্তু) চক্ষুষ্মান (বাসিরান্)।

১২৬. তিনি বলিবেন (কালা), ওইভাবেই (কাজালিকা) তোমার কাছে আসিয়াছিল (আতাক্কা) আমাদের আয়াতসমূহ (আয়াতুনা) সুতরাং তুমি তখন ভুলিয়া গিয়াছিলে (ফানাসিতাহা) এবং ওইভাবেই (ওয়া কাজালিকাল্) আজ (ইয়াওমা) তোমাকে ভুলিয়া যাইব (তুন্শা)।

১২৭. আর ওই রূপেই (ওয়া কাজালিকা) আমরা প্রতিফল দেই (নাজ্জি) যে বাড়াবাড়ি করে (মান্ আস্রাফা) এবং ইমান আনে না (ওয়া লাম ইউমিম্) তাহার রবের আয়াতসমূহতে (বেআয়াতি রাব্বিহি)। এবং আখেরাতের শাস্তি অবশ্যই (ওয়া লা আজাবুল্ আখিরাতি) কঠোর এবং অধিক স্থায়ী (আশাদ্দু ওয়া আব্কা)।

১২৮. তবে কি তাহাদেরকে রাস্তা (পথ) দেখায় নাই (আফালাম্ ইয়াহ্দি লাহুম্) ? কতই না আমরা (আল্লাহ্) ধ্বংস করিয়াছি (কাম্ আহ্লাক্না) তাহাদের পূর্বে (কাব্লাহুম) অনেক কওমের মধ্য হইতে (মিনাল্ কুরুনি) তাহারা চলিতেছে (ইয়াম্শুনা) মধ্য দিয়া (ফি) তাহাদের বাসস্থানসমূহে (মাসাকিলিহিম্)। নিশ্চয়ই উহার মধ্যে (ইন্না ফি জালিকা) (রহিয়াছে) অবশ্যই আয়াতসমূহ (লা আয়াতিল্) বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারীদের জন্য (লিউলিন্ নুহা)।

১২৯. এবং যদি না একটি কালিমা (বাণী) (ওয়া লাও লা কালিমাতুন্) পূর্বে নির্দিষ্ট হইয়া থাকিত (সাবাকাত্) আপনার রবের পক্ষ হইতে (মির্ রাব্বিকা) অবশ্যই হইত (শাস্তি) (লাকানা) (এবং) অবশ্যম্ভাবী (লিজামাও) এবং একটি নির্দিষ্ট সময় (আজালুম্ মুসাম্মান্) (যদি না থাকিত)।

১৩০. সুতরাং সবর করুন (ফাস্বির) তাহারা যাহা বলে (উহার) উপর (আলা মা ইয়াকুলুনা) এবং তসবিহ্ করুন (মহিমা ঘোষণা করুন) (ওয়া সাব্বিহ্) প্রশংসার সহিত (বেহাম্দি) আপনার রবের (রাব্বিকা), সূর্য উদয়ের আগে (কাব্লা তুলুয়িস্ শাম্সি) এবং ডুবিয়া যাইবার আগে (ওয়া কাব্লা গুরুবিহা)। এবং রাতের কিছু অংশ হইতে (ওয়া মিন্ আনাইল্ লাইলি) সুতরাং তসবিহ পাঠ করুন (মহিমা ঘোষণা করুন) (ফাসাব্বিহ্) এবং দিনের অংশসমূহে (ওয়া আত্রাফান্ নাহারি) যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হন (লাআল্লাকা তার্দি)।

১৩১. এবং আপনার চোখ দুইটি প্রসারিত করিবেন না (ওয়া লা তামুদান্না আইনাইকা) আমরা উপকরণ দিয়াছি যাহার প্রতি (ইলা মা মাত্তানা) সেই সম্পর্কে (বিহি) তাহাদের মধ্যকার বিভিন্ন শ্রেণীকে (আজ্ওয়াজাম্ মিন্ হুম্) জাঁকজমক (জাহারাতাল্) দুনিয়ার জীবনে (হায়াতিদ্ দুনিয়া)। ইহার মধ্যে আমরা যেন তাহাদের পরীক্ষা করি (লিনাফ্তিনাহুম ফিহি)। এবং আপনার রবের রেজেকই উত্তম (ওয়া রিজ্কু রাব্বিকা খাইরু) এবং স্থায়ী (ওয়া আব্কা)।

১৩২. এবং নির্দেশ দেন (ওয়া মুর্) আপনার পরিবারকে (আহ্লাকা) সালাতের সহিত (বিস্সালাতি) এবং দৃঢ় থাকুন (ওয়াস্তাবির্) ইহার উপর (আলাইহা)। আমরা (আল্লাহ্) আপনার কাছে চাই না (লা নাস্আলুকা) রেজেক (রিজ্কান্) আমরাই (নাহ্নু) আপনাকে রেজেক দেই (নার্জুকুকা)। এবং (শুভ) পরিণাম (ওয়াল্ আকিবাতু) মুত্তাকিদের জন্য (লিত্তাকুয়া)।

১৩৩. এবং তাহারা বলে (ওয়া কালু), আমাদের কাছে আনে না কেন (লাওলা ইয়াতিনা) তাহার রবের নিকট হইতে একটি আয়াত (বিআয়াতিম্ মির্ রাব্বিহি)। তাহাদের কাছে আসে নাই কি (আওয়া লাম্ তাহ্তিহিম) সুস্পষ্ট প্রমাণ (বাইয়িনাতু) যাহা আছে আগের দিনের সহিফাগুলির মধ্যে (মা ফিস্ সুহুফিল্ উলা)।

[আমাদের কাছে বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে চারটি সহিফার নাম জানা আছে। যেমন কোরান, ইঞ্জিল, জাবুর এবং তাওরাত। ইহার পূর্বেও যে অনেক সহিফা পাঠানো হয়েছিল তারই জ্বলন্ত প্রমাণ হলো এই আয়াতটি। সেই অনেক পূর্ববর্তী সহিফাগুলোর নাম কী কী হতে পারে তার উল্লেখ আমরা কোরান-এ পাই না। কেউ হয়তো এমনও প্রশ্ন করতে পারে যে, সব রকম সহিফাই কি মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো হয়েছে? বিশাল অখণ্ড ভারতে কি একটিও সহিফা দেওয়া হয় নি? কারণ প্রত্যেক কওমের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্পাক রসুল পাঠিয়েছেন। ইহা কোরান-এরই ঘোষণা। তা হলে অখণ্ড ভারতে অনেক কওমের আগমন ঘটেছে, কিন্তু তাদের সহিফাগুলো বর্তমান থাকলেও ধর্মীয় সাইনবোর্ড কাঁধে ঝুলাবার দরুন অনেকেই বেদ, গীতা, উপনিষদ-এর নামগুলো নিতে চায় না। ধর্মের নামে এ রকম সংকীর্ণতার গণ্ডির দেয়ালকে মানবজাতি কবে ভেঙ্গে ফেলতে পারবে? অধম লিখক মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই কোরান-হাদিসের জ্ঞান অর্জনের জন্য গবেষণায় মনোনিবেশ করি, কিন্তু খোদা না খাস্তা আজ যদি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিতাম তা হলে কি কোরান-হাদিসের জ্ঞান অর্জন করার এ রকম আগ্রহটি থাকত? তা হলে কি বেদ-গীতা-উপনিষদ-এর উপর জ্ঞান-গবেষণায় ডুবে থাকতাম? তা হলে বুকে হাত রেখে আপন বিবেকটিকে একদম নিরপেক্ষ রেখে এই কথাগুলোর ভিত্তিতে কি বলতে পারি না যে, আমার জন্মটাই আমার আজন্ম আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ?]

১৩৪. এবং যদি (ওয়া লাও) যে আমরা (আন্না) তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিতাম আমরা (আহ্লাক্নাহুম্) আজাব দিয়া (বিআজাবিম্) তাহার পূর্ব হইতে (মিন্ কাব্লিহি) তাহারা নিশ্চয়ই বলিত (লাকালু) হে আমাদের রব (রাব্বানা), কেননা (লাওলা) তুমি পাঠাইয়াছিলে (আরসাল্তা) আমাদের দিকে (ইলাইনা) কোনো রসুল (রাসুলান্) আমরা যাহাতে অনুসরণ করিতাম (ফাত্তাবিয়া) তোমার আয়াতসমূহ (আয়াতিকা) তাহার পূর্বে (মিন কাব্লি) লাঞ্ছিত হইতাম আমরা (আন্ নাজিল্লা) এবং আমরা অপমানিত হইতাম (ওয়া নাখ্জা)।

১৩৫. বলুন (কুল্) প্রত্যেকেই (কুল্লুন) অপেক্ষাকারী (মোতারাব্বিসুন্) সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো (ফাতারাব্বাসু), সুতরাং তোমরা তাড়াতাড়ি জানিবে (ফাসাতালামুনা) কাহারা (মান্) অধিকারী (আস্হাবুস্) পথের (সিরাতিস্) সঠিক (সাওউয়ি) এবং (ওয়া) কে (মানিহ্) হেদায়েতপ্রাপ্ত (তাদাহ্)।

নফ্স ও রুহের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা

বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (বাবা শেখ ফরিদ)-এর দিওয়ান-এর ফারসি ভাষা ও শব্দগুলো বুঝি, যদিও পুরানো ফারসি ভাষায় রচিত। যদি দু-চারটা শব্দ বুঝতে না পারি তো হাতের কাছে রাখা তিন-চারটা ফারসি অভিধান খুলতে হয়। কারণ এমন শব্দও পাওয়া যায়, যার অর্থটি একটি অভিধানে পেলাম না। তখন হতাশ হয়ে উর্দু অভিধান খুলি। একবার বাবা শামসে তাব্রিজের দিওয়ান-এর একটি ফারসি শব্দ বুঝতে না পেরে অভিধান খুলে না পেয়ে হতাশ হলাম। আমার ভক্ত মাওলানা মাহ্তাব উদ্দিন (ডবল টাইটেল) অবশেষে একটি পুরানো অভিধানে পেল। শব্দটি হলো 'কেচ্কুলা'। অর্থটি হলো, নতুন কাপড় পরিধান করার পর আয়নায় শরীরটি দেখে স্টাইলটা হাত দিয়ে ঠিক করে নেওয়া। বাক্যের সঙ্গে অর্থটির মিল পাচ্ছিলাম না। অবশেষে ফারসি ভাষায় ডক্টরেট জামাল উদ্দিন (বাঙালি নয়) বিষয়টি বুঝিয়ে দেবার পর আনন্দ পেলাম এবং অবাক হলাম বাক্য গঠনের শৈলী দেখে। অথচ বাবা শামসে তাব্রিজ নিরক্ষর ছিলেন। উনি ভাবে তন্ময় হয়ে বলতেন আর মুরিদ মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি লিখে রাখতেন। অনেকটা আমাদের বাউলসম্রাট লালনের মতো। একতারায় গান গাইতেন আর ভক্তরা সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখতেন। শুনেছি বহু গান লিখার অভাবে হারিয়ে গেছে। কিন্তু বাবা শেখ ফরিদের একটি বাক্য অতি সহজ ফারসিতে লিখা এবং শাব্দিক অর্থটি সহজেই করা যায়। কিন্তু ভেতরের অর্থটি আজও বুঝতে পারলাম না। বাক্যটির অনুবাদ হলো, 'পৃথিবীর সব মানুষের জীবনগুলো আমি, বুদ্ধিগুলো আমি এবং দেহগুলোও আমি।' এর ব্যাখ্যা কী লিখব ভেবে পাই না। তবে শুনতে ভালো লাগে। কারণ বিশাল মানবতাবাদের দর্শন বলে মনে হলো। ভেতরের অর্থটি উদ্ধার করার মতো শক্তি নেই বলে এটাই মনে করে নিতে বাধ্য হলাম। তবে এটুকু বুঝতে চেষ্টা করলাম যে, এই কথাগুলো মাথার জ্ঞান নয়, বরং সিনার জ্ঞান! সিনার জ্ঞানটিকে আমরা মাথার জ্ঞান দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি। তাই আসল কথাটি বুঝতে কষ্ট হয়। বাবা ফরিদের আপন ভাগিনা বাবা আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরির কথা আরও বুঝা যায় না। যেমন তিনি বলছেন, 'ইউসুফের রূপ বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে শাস্তি ক্রয় করল, তাই জুলাইখা তার নিজের রূপ নিজেই কিনে নিলেন।' অন্যত্র বলেছেন, 'বলে দাও ফকিরের শান কী॥ এখানে মৃত, আবার একই সময়ে অন্যত্র হেঁটে চলছেন।' এটা না হয় আমরা অনেকেই জানি যে, বাবা বাকি বিল্লাহ্র জানাজা তিনি নিজেই পড়েছেন, অতএব বিষয়টা জানার মতো কিছুটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু সিনার এলেমের বিষয়গুলো মাথার জ্ঞান দিয়ে প্রায়ই বোঝা যায় না। কেবল ধোঁয়াই দেখে যেতে হয়। আগুনের সন্ধান পাওয়া যায় না। এটুকু বুঝতে পারলাম যে, এগুলো বুঝতে হলে মোরাকাবা-মোশাহেদা তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যম ছাড়া বোঝা যাবে না। বাবা শেখ ফরিদ বলেছেন, নূরে মান দার তাংগে নামি তান্মজো, আফতামাব্ জ্বাররা-এ রওশন না আম। আমার দেহটি দেখে আমার ভেতরের নুর খুঁজে কোনো লাভ নাই। কারণ রহস্যলোকের যে সূর্যটি আমার ভেতরে আছে তা মস্তিষ্কপ্রসূত বিদ্যা ও জ্ঞান দিয়ে কিছুই বুঝতে পারবে না। বাবা ফরিদের ভাষায়, কলবের জ্ঞানটি মাথার বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে বোঝাটা মোটেই সম্ভবপর নয়। কারণ মাথার বুদ্ধি ও জ্ঞান দুনিয়ার প্রতিষ্ঠা চায়। মাথার জ্ঞান-বুদ্ধির এ রকম চাওয়াটাই ধর্ম। সুতরাং মোটামুটি একটা সাধারণ জ্ঞানেও দেখতে পাই যে, মাথার জ্ঞান-বুদ্ধি শক্তির পূজা করে, প্রতিযোগিতার পূজা করে, সমাজ-সংসারে মাতব্বর হওয়ার পূজা করে এবং আরও কত কী! আদর্শের বাঁধ দিয়ে, প্রেমের দেওয়াল দাঁড় করিয়ে, শক্তির পূজারককে প্রেম-ভালোবাসার মোকামে ঢোকানোই যায় না। জোর করে ঢোকাতে গেলেই প্রেমের পূজারিরা বুঝতে পারে যে, এরা প্রেমের অভিনয় করতে এসেছে, নিখুঁত অভিনয়। ধরার কোনো ক্লু পাওয়া কষ্টকর। এরাই সুফিবাদের ক্লাসে ঢুকে সুফিবাদের গলায়, নাকে, কানে আর হাতে শাস্ত্রের নানা রকম অলংকার পরিয়ে দেয়। তাই সুফিবাদের উপর গবেষণা করতে গেলে প্রায় স্থানে দেখতে পাই লেজে-গোবরের করুণ দৃশ্যটি। সাধারণ মানুষ হতে দুনিয়াবি বিজ্ঞজনেরা এত উঁচু মাপের কথাগুলো বুঝতে পারে না এবং না পারাটাই একান্ত স্বাভাবিক। মাথার জ্ঞানীদের মাঝে

কলবের জ্ঞানীদের অনেককেই কিছুটা সমীহ করে, আবার অনেকে সমীহ করা তো দূরে থাক, বরং মিটিমিটি হাসে। হাসার কারণটি হলো, কলবের জ্ঞানটিকে কোনো জ্ঞানই মনে করতে চায় না। ভাবখানা অনেকটা এ রকম, মরার পর কী হবে সেটা ভেবে কোনো লাভ নাই। যা হবার তা তো হবেই। শান্তির আর শাস্তির কথাটা এরা ভাবতে চায় না। অনেকে ভাবে, কিন্তু ভাবনার সঙ্গে একখানা এবাদত করার ছক বেঁধে নেয়। এবাদতের দিকটিকে মেনে চললেই হলো। এবাদতের ছকটিতে থাকে কেবল সুখ ও ভোগ। দুনিয়ার সুখ ও ভোগের ধারণাটি দিয়ে পরকালের সুখভোগটি বানিয়ে নেয়। এদের কথা ও কাজে কেবল ভোগ আর ভোগ। ভোগটিও যে এক ধরনের বন্ধন এটা মানতে চায় না। ভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করতে যেমন দুনিয়াতে পরিশ্রম করতে হয়, তেমনটি কিন্তু পরকালের ভোগে থাকে না। কেবল শুয়ে-বসে খাদ্য, পানীয় আর রূপসীর রূপসুধা ভোগ করতে হবে। ভোগ ছাড়া জড়দেহটিকে টিকিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু স্বর্গে ভোগ ছাড়াও দেহটিকে তো টিকিয়ে রাখা যায়। তবে ভোগের এত লোভনীয় আয়োজন কেন? নফ্স (জীবাত্মা) ভোগ ছাড়া অন্য কিছুই বুঝতে চায় না। পরিতৃপ্ত নফ্সকেই (নফ্সে মোত্মায়েন্না) তো জান্নাতে আগমন করার স্বাগতম জানানো হয়। তা হলে পরিতৃপ্ত নফ্সের তো অতৃপ্তি থাকার কথা নয়! যে নফ্স তৃপ্ত তাকে আবার কেমন করে তৃপ্ত হতে হবে? চাওয়া-পাওয়া ভোগ-বিলাস হতে যে নফ্স সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সম্পূর্ণ তৃপ্ত তাকেই তো নফ্সে মোত্মায়েন্না বলা হয়। তা হলে পরিতৃপ্ত নফ্সটিকে আবার ক্ষুধার্ত রূপে কেন দেখব? ভোগ ছাড়া কি নফ্সটি টিকতে পারে না? ভোগ ছাড়া কি নফ্সটি বাঁচতে পারে না? জান্নাতে তো মৃত্যু নাই, বুড়ো হতে হবে না। টগবগে যুবকের মতো থাকতে হবে। জান্নাতে কোনো প্রকার কাজ ছাড়া কেবল সুখভোগ করাটাও তো একটি সূক্ষ্ম বন্ধন বলে মনে হতে চায়। তবে এ রকম সুখভোগটিকে নির্মল পবিত্র মহানন্দ বলা যায় এবং এটাও একটি খাস রহমত। এটাকে অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার যারা করে, তারাও নীতিহীন নীতির বচন শুনিয়ে আনন্দ পায়। সংস্কারের জটিল অংক বানিয়ে নেগেটিভ দর্শনটি প্রচার করে পণ্ডিত সাজতে চায়। সব স্থানে সব বিষয়ে পণ্ডিতি চলে না। অনেক স্থানে অনেক পরিবেশে মনের অপছন্দটিকে মেনে নিতে হয়। সুতরাং বেহেশ্তে অবশ্যই সুখ ও ভোগ আছে। আর আছে ভোগের অকল্পনীয় সব রকম ব্যবস্থা। নফ্স যতই পরিশুদ্ধ হোক না কেন, যতই পরিতৃপ্ত হোক না কেন, জান্নাতে আসবার সুসংবাদটি এ জন্যই জানানো হচ্ছে যে, নফ্সের ধর্মই ভোগ। সেই ভোগটি যতই মার্জিত হোক না কেন, তবুও ভোগের জন্যই নফ্সের সৃষ্টি। ভোগই নফ্সের তকদির। আম্মারা নফ্সের ভোগটি দুঃখের। সুতরাং জাহান্নামে গিয়ে অকল্পনীয় দুঃখ ভোগ করতেই হবে। নফ্সে লাওয়ামার ভোগটি মিশ্রিত। দুঃখ এবং সুখ দুটোই ভোগ করতে হবে। তবে প্রথমে এক বোঝা দুঃখ ভোগ করার পর সুখ-সাগরের ভোগ। ভোগের জন্যই বানানো হয়েছে নফ্সটিকে। কিন্তু রুহ তথা পরমাত্মা ভোগ করে না। ভোগ না করাটাই রুহের তথা পরমাত্মার তকদির। রুহ তথা পরমাত্মাটি এক এবং অখণ্ড। রুহ তথা পরমাত্মাটির বহুবচন নাই। 'অনেক রুহ' কোরান বলে নি। কোরান রুহকে সর্বস্থানে একবচনে ব্যবহার করেছে। রুহ বিষয়টি কোরান-এ মাত্র সতের বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সর্বস্থানেই একবচনে রুহকে পাই। বহুবচনের প্রশ্নই ওঠে না। পক্ষান্তরে নফ্সকে একবচনে পাওয়া যায় না, বহুবচনে পাওয়া যায়। প্রতিটি নফ্সকে মৃত্যুর স্বাদ তথা মজা গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু রুহের মৃত্যুর স্বাদ তথা মজা গ্রহণ করার কথাটি কোরান-এ নাই। নফ্স জন্ম-মৃত্যুর অধীন। নফ্স সুখ-দুঃখের অধীন। নফ্স পরিশ্রম ও বিশ্রামের অধীন। নফ্স চঞ্চল, দিশেহারা, হা-হুতাশ আর হাসি-ঠাট্টার অধীন। নফ্স প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, উত্তর আর অতৃপ্তির অধীন। নফ্স নতুন নতুন ভোগ-লালসার অধীন, তাই কল্পনা ও গবেষণার অধীন। ফুলের মালা আর ফাঁসির মালা দুটোই নফ্সকে পরতে হয়। নফ্স হিংস্র, তাই হিংস্রকেই সম্মান করে। তাই হিংস্র সিংহকে বনের রাজা বানায়। বাঘের নামটি নিজের নামের আগে-পিছে দিতে গর্ববোধ করে। কারণ নফ্স বহুরূপী। নফ্স রঙ্গিলা। নফ্সের কার্যকলাপ একেক স্থানে একেক রকম। কোথাও ভোগী, কোথাও ত্যাগী। কোথাও শক্তির পূজায় বিভোর আবার কোথাও প্রেমের পূজায় মশগুল। কোথাও রাজসিংহাসন পাবার আশায় চক্রান্তের জটিলতা পাকায়, আবার কোথাও সিংহাসন ফেলে স্বেচ্ছায় ফকিরির মলিন বসন পরিধান করে। নফ্সের এ রকম উল্টাপাল্টা চরিত্রটি না থাকলে দুনিয়ার খেলাটি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু রুহ তথা পরমাত্মার কোনো কাজ থাকে না। রুহ তথা পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অবস্থানটি কেবলমাত্র দুইটি প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করে। একটি মানুষ এবং অপরটি জিন। (অবশ্য আমার জানা মতে, কারণ অন্য গ্রহে যদি জীব থাকে?) রুহ তথা পরমাত্মাটি সৃষ্টির আর কোথাও নাই। তাই মানুষকেই আমরা মুনি-ঋষি, ওলি-আউলিয়া, আবদাল-আরিফ, রসুল এবং নবিরূপে দেখতে পাই। রুহ তথা পরমাত্মাটি যখন জীবাত্মার খোলস নামের ডিম হতে বেরিয়ে আসে, তখন জীবাত্মার খোলসটি কেবলই বাহনের ভূমিকা পালন করে। বাহন দেহটি সঙ্গে না থাকলে রুহ তথা পরমাত্মার পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ রুহ নিরাকার। আকার যার আছে সে নিরাকারটিকে বুঝতে পারে না। তাই রুহ মানব আকারের মধ্যে প্রকাশিত হয়। রুহ-এর কখনোই জান্নাতের সুখভোগ এবং জাহান্নামের দুঃখভোগ করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ভোগের ঊর্ধ্বে রুহের তকদির। তবে রুহের তকদির অসীম। নফ্স ভোগ করে, কিন্তু অনেকেই ভুল করে নফ্সের স্থলে রুহকে টেনে আনে। কারণ নফ্স আর রুহের উপর পরিষ্কার ধারণাটি না থাকলে এমনটি হতে বাধ্য। তাই অনেক সময় মুখ ফস্কে বলে ফেলি যে, যারা নফ্স আর রুহের পার্থক্যটি করতে পারে না, তারা আবার কেমন করে সুফি এবং ইসলাম-গবেষক হয়? রুহ যেমন ভোগের ঊর্ধ্বে, তেমনি সৃষ্টি-জগতেরও ঊর্ধ্বে। তাই রুহ সেখানে প্রকাশিত হবে যেখানে ফেরেশতাদের আগমন অবধারিত। রুহ জন্মগ্রহণ করে না এবং জন্ম দেয়ও না। রুহ ডোবেও না উদিতও হয় না। রুহ সব সময় ভাসমান (সোবহান)। তাই রুহের বিষয়টি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে বীজরূপী রুহকে জাগিয়ে তোলা যায়। ধ্যানসাধনার নিয়মগুলো আপন গুরু জানিয়ে দেবে। গুরুর আদেশ অনুসারে ধ্যানসাধনা করার পর যদি ব্যর্থ হয় তো অন্য গুরু ধরা ফরজ। অবশ্য সবার জন্য নয়। কারণ সবাই ধ্যানসাধনা করে না। যারা সাধক কেবল তাদেরকেই কথাটা বলছি। সাধক, গুরুর পর গুরু বদলাতে পারবে। গুরু যদি অন্ধকার হতে আলোর পথটি দেখাতে না পারেন, তো কেমন গুরু? সাধকের জন্য এ রকম গুরুকে বর্জন করা অবশ্যকর্তব্য। এক বস্তা কথা আর বই পড়ে সত্য পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় ধ্যানসাধনার মাধ্যমে। এই বিষয়টাই মহানবি হাতে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন হেরা গুহায় নির্জন ধ্যানসাধনা করে। মহানবি এ রকম ধ্যানসাধনার বহু ঊর্ধ্বে। কারণ প্রথম মানব আদম যখন কাদামাটিতে তখনও তিনি মহানবি। মহানবি নিজে আগে হেরাগুহায় ধ্যানসাধনাটি করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। কেউ বোঝে, আবার কেউ বোঝে না। তবে এ বিষয়টি ভালো করে জেনে রাখা ভালো যে, যাদের ধ্যানসাধনার পথে

এগিয়ে যাবার আগ্রহ থাকবে না তাদের গুরু পরিত্যাগ করা মোটেই সমীচীন নয় বলে মনে করি। কারণ এতে হিতে বিপরীত হয়। কারণ গুরু ধরা এবং গুরু পরিত্যাগ করাটা আগুন নিয়ে খেলা করা। কারণ এটা স্কুল-কলেজের গুরু নয় যে মাথার জ্ঞান শিক্ষা দেবে। তাই তো বু আলি শাহ কলন্দর তাঁর মুরিদদেরকে মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করার জন্য বারবার বলেছেন। উনি তো অনেকটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, আমার কথামতো মাত্র তিনটি চল্লিশ দিনের মোরাকাবা করে যদি এলমে লাদুনির সামান্য পরিচয়টুকু না পাও, তো দুই হাতে দুটি পাথর নিয়ে আমার মাজারে ছুঁড়ে মেরে দিয়ে বলে দিয়ো, কলন্দর মিথ্যুক। কলন্দর বাবা ফরিদের মুরিদ ও খলিফা। বাবা ফরিদ বাবা কুতুব উদ্দিন বকতিয়ার কাকীর মুরিদ ও খলিফা। বাবা কুতুব উদ্দিন সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিব নেওয়াজের মুরিদ ও খলিফা। চিশতিয়া হতে কয়েকটি শাখা বেরিয়েছে। তার মধ্যে সাবেরিয়া ও কলন্দরিয়া দুইটি অন্যতম প্রধান শাখা। কলন্দরিরা আচার-অনুষ্ঠানের তেমন একটা গুরুত্ব দেন না। মোরাকাবার ধ্যান-সাধনাটি অনেক প্রকার। একেক গুরুর ধ্যানসাধন পদ্ধতি একেক রকম। ঘাট অনেক, পুকুর একটাই। তাই বাবা জানশরীফ শাহ সুরেশ্বরী মোরাকাবার ধ্যান-সাধনার তেইশ রকম পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন। কেবল ধনসম্পদের নেশায় কাটিয়ে দিলাম জীবনটা : মাত্র একটি চল্লিশ দিনের মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করে যেতে পারলাম না। পূর্ণতা অর্জন করতে পারি নি বলে কি এলমে লাদুনির তথা এল্‌মে কল্‌বের সামান্য নিদর্শনটি জানবার সময়টুকু বের করে নিতে পারলাম না? কেবল রূপসী রমণীর দেহভোগের হেরোয়েঞ্চি হয়ে রইলাম। এমন বদনসিব নিয়ে কেবল কলুর বলদের মতো খেটে গেলাম। তাই তো লালন বলছেন,'এমন মানব জনম আর তো হবে না, মন জয় করো তোমার মনের বাসনা।'

কোরান নফ্‌সকে জীবাত্মা বলে নি, নফ্‌সকে নফ্‌সই বলেছে। আমরা নফ্‌সকে আমাদের বুঝবার সুবিধার জন্য জীবাত্মা বলি। সব জীবের মধ্যে নফ্‌স আছে, কিন্তু রুহ নাই। রুহ কেবলমাত্র জিন ও মানবকে দান করা হয়েছে। রুহ সঙ্গে না থাকলে নফ্‌স সাধারণ জীবে পরিণত হয়। এ জন্য মানুষ জীব হয়েও যা করতে পারে অন্য কোনো জীব তা করতে পারে না। তার মানে হলো, অন্য কোনো জীবের মধ্যে রুহ নাই এবং এই না থাকার দরুন সব জীব সাধারণ। সাধক জীবের মধ্যে স্রষ্টার পরিচয় খোঁজে, কিন্তু আসল পরিচয়টি মানুষ ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। রুহ মানুষ এবং জিন নামক জীবের মধ্যে আছে বলেই শয়তানকে সঙ্গে রাখা হয়েছে। শয়তান সঙ্গে আছে বলেই পৃথিবীতে জাগতিক সভ্যতার প্রসার ঘটছে দিনের পর দিন, ধাপে ধাপে বিবর্তনের রূপটি ধারণ করে। শয়তান মানবসভ্যতা বিস্তারে সহায়কের ভূমিকা রাখে। শয়তানের কাঠমিস্ত্রি, মণি-মুক্তা সংগ্রহকারী এবং ডুবুরির ভূমিকা পালন করার কথাটি কোরান-এর ৩৮ নম্বর সূরা সোয়াদের ৩৭ নম্বর আয়াতে পাই। নবি দাউদ ও সোলায়মান শয়তানদের দ্বারা অনেক মানবসভ্যতার কাজ করিয়ে নিয়েছেন। দ্বান্দ্বিক দর্শনের মতো শয়তানের ভূমিকা। মানবসভ্যতা বিস্তারের ভূমিকায় শয়তান সহায়ক, কিন্তু রুহকে নিজের মধ্যে জাগ্রত করার প্রশ্নে শয়তান ঘোরতর শত্রু। এ জন্যই শয়তানের ভূমিকাটি এতই জটিল এবং সূক্ষ্ম যে, যে কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত টানতে গেলেই লেজে-গোবরে অবস্থাটি দেখা দেয়। তালগোল পাকিয়ে ফেলি। কখনও দড়িকে সর্প মনে করে হাতে নিই, আবার কখনও সর্পকে দড়ি মনে করে হাতে নিই। হাতে না নেওয়া পর্যন্ত দড়ি আর সর্পের পার্থক্যটি বুঝতে কষ্ট হয়। শয়তানই বারবার ধরণীতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থাপত্রটি হাতে তুলে দেয়। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী শয়তানের রকমসকম যিনি মনে-প্রাণে ধরতে পারেন তিনিই ধ্যানসাধনায় ডুব দেন। কামিয়াব হতে পারলেই মুক্তি। মুক্তিতে আগমন থাকে না। ইচ্ছাকৃত আগমনেও মুক্ত মানব। মহাপুরুষ। মুক্তির প্রচার করে যান। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির।

হজরত আজাজিল ছয় কোটি বছর আল্লাহ্‌র গুণগান গাইলেন। এক লক্ষ বছর কেবল 'আল্লাহু' জিকির করলেন। তারপর এক লক্ষ বছর 'সোবহানাল্লাহ' জিকির করলেন। তারপর এক লক্ষ বছর 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়লেন। তারপর এক লক্ষ বছর ধরে কেবল 'আল্লাহু জাল্লাশানাহু' পড়লেন। এভাবে আল্লাহ্‌র একেকটি গুণবাচক নাম ধরে পড়লেন। এতে আল্লাহ্‌ এতই খুশি হলেন যে, জিন জাতি হতে আগত আবুল গাম্ভিবের ছেলে আজাজিলকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি যাদেরকে ভালো-মন্দ দিয়ে তৈরি না করে কেবল ভালো গুণ দিয়ে তৈরি করেছেন, সেই ফেরেশতাদের সর্দার বানিয়ে দিলেন। মানুষের মতো জিনদেরকেও ভালো এবং মন্দের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং নির্বাচন করার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি কোরান মতে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নি, একমাত্র মানব এবং জিন ছাড়া। আল্লাহ্‌ ভালো করেই জানতেন যে, তেলে আর জলে কোনোদিন মিল খাবে না। তবুও জেনে-শুনেই ফেরেশতাদের সর্দার বানিয়ে দিলেন আজাজিলকে। আজাজিল খুবই খুশি, কারণ এত বড় সম্মান আর ইজ্জত পাওয়াটা চারটিখানি কথা নয়। তেলে আর জলে যে কখনোই মিল খাবে না এটা কিছুদিন পরেই ধরা পড়ে গেল। এবং এক লাফে সম্মানের আকাশ হতে আজাজিল মাটিতে পড়ে গেল। কারণটি কী? মাত্র একটি কারণ। আদমকে সেজদা করতে বললেন আল্লাহ্‌। সবাই সেজদা করেছিল, কিন্তু আজাজিল করে নি। এই না করার কারণটি ছিল : মাটি এবং আগুন কখনও এক নয় বলে সে ঘোষণা করল এবং আগুন মাটি হতে উত্তম বলে ঘোষণা করল। ফেরেশতাদের স্বাধীনতা নেই, কারণ তাদেরকে স্বাধীনতা দেওয়াই হয় নি। তাই বিনাবাক্যে তারা সবাই সেজদা করলো তথা আদমের আনুগত্য গ্রহণ করলো এই বলে যে, আদমকে যে বিশাল জ্ঞান দান করা হয়েছে, সেই জ্ঞানের বিন্দু-বিসর্গও তাদের জানা নাই। আদমের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ্‌কে পাওয়া যাবে না জানবার পরও আজাজিল সেজদা করতে অস্বীকার করে অহংকার করল। অহংকারটিকে কোরান-এর ভাষায় 'বালাসা' বলে। আর যে অহংকার করে তাকে কোরান-এর ভাষায় ইবলিস বলা হয়। ইবলিস সোজাসুজি আল্লাহ্‌কে ডাকে। মাধ্যম মানে না এবং মাধ্যম নিতে ঘৃণা বোধ করে। আদমকে সেজদা করতে তথা আনুগত্য গ্রহণ করতে তথা পূজা করতে অস্বীকার করল। কারণ ইবলিসের মতে আদমপূজা ইসলামেতে নাই। মুসা নবির সময় নাজাতের জন্য ইবলিসকে আদমের মাজার পূজা করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু ইবলিস সোজা বলে দিল যে, আদমপূজা-মাজারপূজা ইসলামেতে নাই। এই বিষয়টি সুন্দর করে তুলে ধরেছেন হজরত আমির খসরু তাঁর রচিত কুল্লিয়াতে আমির খসরুতে। মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়া এবং খাজা গরিবে নেওয়াজ-এর পীর খাজা উসমান হারুনি এবং বাংলার বাউলসম্রাট লালন ফকির একদম সোজা ভাষায় বলে গেছেন। তবে মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কথাগুলো অতি চমৎকার এবং বিস্ময়কর এবং বিশেষ জ্ঞানীদের জন্য গ্রহণযোগ্য। হজরত আমির খসরুর ভাষায় তাঁর পীর মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়া বলেছেন যে, তোমরা ভালো করে দেখো তো, উসুজুদুর পর তাহিয়া অথবা

তাজিমি শব্দটি কোরান-এ ব্যবহার করা হয়েছে কি-না। সেজদার সঙ্গে সম্মান শব্দটি মাথার জ্ঞানীরা লাগিয়ে নেন এবং অনেক রকম কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে সহজ-সরল বিষয়টিকে জটিল, ঘোলাটে করে তোলেন। তাই সাধারণ মানুষ মাথার জ্ঞানীদের মারপ্যাঁচের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে চলে এবং উলঙ্গ সত্যটিকে তখন আর বুঝবার তাদের জো থাকে না। মক্কার জাহেরি কাবাটিকে তোয়াফ ও সেজদা করার বিধান শরিয়তে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া মক্কায় জাহেরি তিনটি শয়তান আছে। একটি বড় শয়তান, একটি মাঝারি শয়তান এবং একটি ছোট শয়তান। হাজিরা এই জাহেরি শয়তানকে কঙ্কর ছুঁড়ে মারে এবং যে-কঙ্কর ছুঁড়ে মারে সেইটাও জাহেরি কঙ্কর। বাতেনি শয়তান বাহিরে থাকে না। উহা থাকে প্রতিটি মানুষের অন্তরে। মানুষ এবং জিনের অন্ত র ছাড়া শয়তানের থাকার আর কোনো স্থান সৃষ্টিজগতে নাই, ইহা কোরান-এর প্রকাশ্য ঘোষণা। বাতেনি শয়তানের পরিচয় জানার জন্য বাহিরের শয়তানের প্রয়োজন। বাহিরের শয়তানকে জীবনভর কঙ্কর ছুঁড়ে মারলেও ভেতরের শয়তানটিকে সরিয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ বাহিরের তিনটি জাহেরি শয়তানকে পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে। সেই পাথরও তৌহিদে বাস করে। কারণ সৃষ্টিজগৎ তৌহিদে বাস করে, ইহা কোরান-এর প্রকাশ্য ঘোষণা। সুতরাং হাজিদের হাতের কঙ্কর নামক পাথরের টুকরাগুলোও তৌহিদে বাস করে। জাহেরি কাবা-তোয়াফ করাটাও জাহেরি তোয়াফ এবং শরিয়তে সামর্থ্যবানদের জন্য ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাতেনি কাবাটি যে মোমিনের কাল্‌ব, আমানুর কাল্‌ব নয়, ইনসানের কাল্‌ব নয় এবং আলবাবের কাল্‌ব নয়। যিনি মোমিন তার কাল্‌বই বাতেনি কাবা। বাতেনি কাবার তোয়াফ বাতেনিতে করতে হয়। বাতেনির সঙ্গে জাহেরকে জড়ানো যায় না। সুতরাং বাতেনি কাবার তোয়াফ ও সেজদা বাতেনিতে ফরজ। মক্কার জাহেরি তিনটি শয়তান যেমন আসল তথা বাতেনি শয়তান নয়, বরং একদম জাহেরি এবং জাহের-পরস্তদের জন্য কঙ্কর নিক্ষেপ করা ফরজ। সেই রকম জাহেরি কাবার জাহেরি তোয়াফ করাটি জাহের-পরস্তদের জন্য ফরজ। তাই তো দিল্লির বিখ্যাত ওলি হজরত সারমাস্ত বলতেন যে, আমার কামেল গুরু বাবা হারে ভারেই আমার আসল কাবা, আর মক্কার কাবাতে গিয়ে দেখো, দেখতে পাবে একটা খালি ঘর। খাজা গরিবে নেওয়াজের পীর খাজা উসমান হারুনি তো একদম খোলামেলা বলেই ফেলেছেন যে, আমি ফরজ এবাদত করার চেয়ে আপন গুরু হাজি শরিফ জিন্দানাকে সেজদা করতে বেশি আগ্রহী। (ফারসি ভাষায় রচিত কথাগুলোর অনুবাদ আরও উলঙ্গ, আরও খোলামেলা। তাই কিছুটা ঢাকনা দিয়ে লেখলাম)। আবার বাউলসম্রাট লালন ফকির তো একদম সোজা বলেই ফেলেছেন, আদমকে এ জন্যই সেজদা করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ স্বয়ং আদমের মধ্যে নুরে মোহাম্মদিরূপে বিরাজ করছেন। সুতরাং যারা বলে যে, আদমপূজা, মাজারপূজা ইসলামেতে নাই, তাদের এবাদত-বন্দেগির সঙ্গে আজাজিলের এবাদত-বন্দেগির কত চমৎকার মিল পাওয়া যায়। আপনাদের গবেষণা করার অধিকার আছে। আর আছে যুক্তি প্রদর্শন করার স্বাধীনতা। কিন্তু অন্যরা গবেষণা এবং যুক্তি প্রদর্শন করলেই কেন গাত্রদাহ হয়? কামেল গুরুকে আনুগত্যের সেজদাটি অবশ্যই করতে হবে। নতুবা কিছুই পাবার আশা করা যায় না। জাহেরি সেজদা করাটা এখানে মুখ্য নয়। অনেকে করেন, অনেকে করেন না। কারণ জাহেরি সেজদা করার পর মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় এবং অনেকে নেয়। কিন্তু আনুগত্যের সেজদাটি বাতেনি এবং মুখ ফিরিয়ে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জালালি পীর বাবা আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি তাঁর এক ভক্তকে বলেছিলেন এই বলে যে, দেখো বাবা, জীবন দেওয়া যত সহজ, তার চেয়ে বহু গুণে কঠিন হৃদয় দেওয়া।

(বড়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বারবার বলতে হচ্ছে, বলতে হচ্ছে আপন বিবেকের বারবার বোবা চিৎকারধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতে যে, বাংলার বুকে কি একজনও পীর নাই, যিনি ওলি-আল্লাহ্‌দের ফারসি ভাষায় রচিত মহামূল্যবান বইগুলো সংগ্রহ করে অথবা ফটোস্ট্যাট করে সেই বইগুলোর সরল বঙ্গানুবাদ করে প্রচার করবেন?)

মাথার জ্ঞান ও সিনার জ্ঞানের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা

ওহাবিদের বর্তমান রাজ্য সৌদি আরব কী সুন্দর বুদ্ধি করে মুসলিম জাহানের প্রতিটি মাদ্রাসা হতে ফারসি ভাষাটিকে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং দিয়েছে! আরও দুঃখের বিষয় যে, ইরানের মাতৃভাষা ফারসি হওয়া সত্ত্বেও তারা শিয়া ফেরকার মুসলমান। শিয়া ফেরকার মুসলমানেরা ওহাবিদের মতোই সুফিবাদ মানে না। এ যেন টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। আর যদি ইরানি শিয়া ফেরকার মুসলমানেরা সুফিবাদকে গ্রহণ করে নিতেন, তা হলে ওলি-আল্লাহদের রচিত হাজার হাজার মহামূল্যবান বইগুলো আজ আমরা অনায়াসে পেতাম। বাংলাদেশের পীর সাহেবেরা প্রত্যেকেই নিজেকে গাউসুল আজম বলে ঘোষণা করেন। জাঁকজমকপূর্ণ চোখ ঝলসানো ওরস পালন করেন প্রতি বছর এবং এর জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করেন। এই টাকার একটি ভগ্নাংশও যদি প্রচারের জন্য ব্যয় করা হতো, তা হলে ওহাবি মতবাদের ভিত্তি ভূমিকম্পের মতো থরথর করে কেঁপে উঠত। কিন্তু আফ্‌সোস! আমার এই কথা, আমার এই ফরিয়াদ, আমার এই বিলাপ, বাংলার আকাশে-বাতাসে কেবলই বোবা প্রতিধ্বনি করবে। অধম লিখক আরও বলতে চাই যে, ওহাবি মতবাদের প্রচার ও প্রসার এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, একদিন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুফিবাদকে হয়তো ভুলে যেতে পারে। এমনকি প্রতিটি টেলিভিশনের চ্যানেলেও আজ ওহাবি মতবাদের প্রকাশ্য প্রচার চলছে। অথচ আহ্‌লে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীদের একটিও টেলিভিশন চ্যানেল নাই। শুনলে অবাক হবেন যে, কাদিয়ানিদের মতো একটি বাতিল ফেরকার নিজস্ব টেলিভিশনের চ্যানেল আছে এবং সেই টেলিভিশনের চ্যানেলে দিবারাত্রি কাদিয়ানিদের মতবাদ প্রচার করা হয়। এমন একদিন হয়তো আসতে পারে যে, সুফিবাদে বিশ্বাসী পীর-ফকিরদের গাট্টিবোঁচকা হাতে নিয়ে বিদায় নিতে হবে অথবা নাকি কান্নায় ওহাবিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বর্ণচোরা পীর-ফকির সেজে থাকতে হবে। অধম লেখকের মনে হয়, আমার কথাগুলো তিক্ত, কিন্তু অপ্রিয় সত্য। আহ্‌লে সুন্নাতুল জামাতের প্রখ্যাত এবং পরম শ্রদ্ধেয় সুফিবাদের ধারক ও বাহক মুফ্‌তি ইয়ার আহম্মদ খান নইমির

উনিশ খণ্ডে উর্দু ভাষায় রচিত কোরান-এর তফসিরটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করলে ওহাবি মতবাদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। আমরা আশা করবো বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই তফসিরটি অনুবাদ করবেন।

আদমের মাধ্যম ছাড়া যেমন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায় না, সেরকমভাবে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান হবার পরও কোরান, ইঞ্জিল, জাবুর এবং তাওরাত পাঠাতে গিয়ে দুইটি মাধ্যম গ্রহণ করেছেন : একটি রূহুল আমিন এবং অপরটি নবি। আমরা এই চারটি আসমানি কেতাব দুই-দুইটি মাধ্যমে পাই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তো অন্য যে কোনো প্রকারে তাঁর কালাম পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তিনি কেন জেনে- শুনে দুইটি মাধ্যম নিতে গেলেন? এখানেও তো বিরাট একটি রহস্য লুকিয়ে আছে। সৌদির বাদশাহ্ যদি হাজিদের বাঁধাই করা কালামপাক সোজাসুজি উপহার দিতে পারেন, তা হলে যিনি সমস্ত জগৎসমূহের বাদশাহর বাদশাহ, তিনি কি আমাদের হাতে তাঁর কালাম তুলে দিতে পারতেন না?

আজাজিলের ছয় কোটি বছরের এবাদতের সঙ্গে আমাদের এবাদতটি যেন মিলেমিশে একাকার না হয়ে যায়, সে দিকটা ভালো করে লক্ষ রাখতে হবে। আজাজিল মাধ্যম মানে নি। আর আমরাও যদি আজাজিলের মতো মাধ্যমটিকে অস্বীকার করি, তা হলে আমাদের এবাদতের পার্থক্যটি কোথায় রইল? আজাজিল খান্নাসরূপ ধারণ করে মানুষের ভিতর ঢুকবার অনুমতি পেয়েছিল, সেই খান্নাসটি কি সরাতে পেরেছি? না পারলে উভয়ের এবাদতের মাঝে মিল পাওয়াটাই স্বাভাবিক। আর তাই যদি হয়, তো যত আখেরি মোনাজাত, যত শানদার মোনাজাত, যত জালালি মোনাজাতই করা হোক না কেন, যেমনকার কপাল তেমনই থেকে যাবে। বদলাবার লক্ষণটি যে দেখতে পাই না। কিছু ভীতু আহ্‌লে সুন্নাতুল জামাতের আলেমেরা রথও দেখতে চায়, আবার কলাও বেচতে চায়। যেন হাত বাড়ালেই অনেক মনগড়া বানোয়াট কথাবার্তার আবর্জনার স্তূপ দেখতে পাই। এই আবর্জনার স্তূপ সরাতে গিয়ে দু-চারটে ভুল করলেও ভালো, জেনেশুনে ভণ্ডামি করার চাইতে।

মক্কায় হজ করতে গিয়ে আমরা যে তিনটি শয়তান দেখতে পাই, তা পাথর দিয়ে বানানো। তিন-তিনটি শয়তান তিন-তিনটি স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ স্থানে দাঁড়িয়ে–থাকা তিনটি শয়তানকে কঙ্কর ছুঁড়ে মারতেই হবে। কারণ হজের কয়টি নিয়মের মাঝে এটাও একটি নিয়ম। কিন্তু আসলেই কি এই পাথর দিয়ে বানানো শয়তান তিনটি আসল শয়তান? নাকি প্রতীকী শয়তান? নাকি জাহেরি শয়তান? কারণ, কোরান মতে, শয়তান বাস করে কেবলমাত্র মানবের আর জিনের অন্তরে তথা দিলে। দিলের শয়তানটিকে কয়বার জীবনে পাথর ছুঁড়ে মারতে পেরেছি তা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করুন। কারণ যে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে পারে না সে তো রহস্যরাজ্যে কোনোদিন প্রবেশ করতে পারে না। তা সে ডিগ্রিধারী যত বড় মাথার জ্ঞানী হোক না কেন। সাঁতার না জানলে যেমন অথৈ জলে ডুবে মরতে হয়, সে রকম সিনার এলেম হাসিল করতে না পারলে বারবার ভবনদীতে ডুবে মরতে হয়॥ যাকে পুনর্জন্ম, পুনরুত্থান, কেয়ামত অথবা যে নামেই বলা হোক না কেন। ইমামুল আউলিয়া বাবা বায়েজিদ বোস্তামি মুরিদদেরকে উপদেশ দিতেন এই বলে যে, দেখো বাবা, মাথার জ্ঞান-গবেষণা যতদিন তোমার ভেতর থাকবে, ততদিন সিনার এলেমের দর্শন পাবে না। কেবল পড়েই যাবে। আর যেদিন এলমে লাদুনি হাসিল করতে পারবে, সেদিন লেখাপড়া থাকবে না। কারণ তখন দর্শন লাভ করবে। তাই লেখাপড়ায় পণ্ডিত হতে পারবে, কিন্তু দর্শন পাবে না। আর যেদিন এলমে লাদুনি হাসিল করে দর্শন লাভ করবে, সেদিন শিশুর মতো বোকা বনে যাবে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি এলমে লাদুনি হাসিল করার পর আর কলমই ধরেন নি। অনেকটা মজ্জুবের, গালবাতের হালতে থাকতেন এবং শিশুর মতো ফ্যালফ্যাল করে কেবল চেয়ে থাকতেন। এহইয়াউ উলুমুদ্দিন এবং কিমিয়ায়ে সাদাত ইমাম গাজ্জালির সাধনরাজ্যে গমন করার আগের রচনা। তাই কথায় বলে, কথার যেখানে শেষ, প্রেমের শুরুটা সেখান থেকেই। বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী নূরে হক গঞ্জে নূর নামক কেতাবে পুঁথির ভাষায় লিখেছেন :

শয়তান এলেম যে সাগর প্রবল
পৃথিবীর আলেমগণ এক বিন্দু জল ॥
কিন্তু সে (শয়তান) কাতর আছে এশ্‌কের বিদ্যায়।
আশেক মাশুক ভেদ পাইবে কোথায় ॥

মাথার জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রচুর পড়াশুনা করতে হয় এবং প্রচুর জ্ঞান গবেষণা করতে হয় এই জ্ঞান গবেষণার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। এই জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং মনে হয় এই এগিয়ে যাবার শেষ নাই। কিন্তু সিনার এলেম হাসিল করতে হলে নির্জন ধ্যানসাধনা ছাড়া সম্ভব হয় না। মাথার জ্ঞান চোখ খুলে অর্জন করতে হয়। অথচ সিনার এলেম হাসিল করতে হলে চোখ বুজে ধ্যানসাধনায় ডুবে থাকতে হয়। খুব কম করে হলেও মাত্র একটানা চার মাস। বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী নূরে হক গঞ্জে নূর নামক কেতাবে পুঁথির ভাষায় লিখে গেছেন :

ওস্তাদ শিখায় বিদ্যা নিরখিয়া দেখ।
মোর্শেদ কহেন বাপু চক্ষু মুদে থেক ॥
চক্ষু বন্ধ বিদ্যা এই খুলিলে কি হবে।
খোলা জন এই ভেদ কভু নাহি পাবে ॥

সুতরাং আবার বলছি তাদেরকেই যারা সুফিবাদে ডুব দিতে আগ্রহী : বুকে হাত রেখে বলুন তো! মক্কার ওই তিনটি পাথরের বানানো শয়তানগুলো কি আদৌ শয়তান? নাকি প্রতীকী শয়তান? জাহেরি শয়তান? যে-কাবা ঘরটিকে তোয়াফ করা হয়, উহা কি আদৌ কাবা? নাকি প্রতীকী কাবা? নাকি জাহেরি কাবা? আমরা কেবল কাবা ঘরটির উপাসনা করি না, বরং কাবা ঘরের যিনি মালিক সেই আল্লাহ্ রাব্বুল আল আমিনকে সেই ঘরে হাজির-নাজির জেনেই

উপাসনা করি। আমরা যে প্রতীকী কাবার তোয়াফ করি, উহা কি আদৌ তোয়াফ? নাকি প্রতীকী তোয়াফ? নাকি জাহেরি তোয়াফ? তাই তো বাবা শামসে তাব্রিজ, হাফিজ সিরাজি এবং বু-আলি শাহ কলন্দর বলেছেন, আপন পীর কাবাকে কেবলা করে তোয়াফ যেদিন করতে পারবে সেদিনই রহস্যলোকে ঢুকতে পারবে। প্রতীকী তিনটি শয়তান মক্কাতেই অবস্থান করে। সুতরাং কঙ্কর মারতে হলে সেখানেই যেতে হবে। আর যদি নিজের ভেতরের শয়তানটিকে কঙ্কর মারতে চাও তো যেখানে আছে, সেখানেই মারতে পারবে। একটি বিশেষ, অপরটি সার্বজনীন। একটি কেবল ধনীদের জন্য, অপরটি সবার জন্য। বাহির এবং ভেতর দুটোর মিলনের নামই ইসলাম। ভেতরটিকে বাদ দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বিষয়টি তখন প্রাণহীন দেহের মতো হয়ে যায়। আবার দেহ নামক খোলসটিকে বাদ দিলে বিমূর্তে পরিণত হয়। মোমিনের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র অবস্থান। তাই মোমিনের জন্য সুনিশ্চিত বিজয়, বলেছে কোরান। মাত্র হাতেগোনা তিনশত ষাটজন মোমিন : রাজা গৌরগোবিন্দ নিয়মিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ যুদ্ধ করে সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করে আগুনের জ্বলন্ত শিখায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। চারশতের কিছু বেশি মোমিন : পরশুরামের মতো প্রতাপশালী রাজা বহু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য নিয়ে শাহ সুলতান বলখিয়া রুমির মতো সাধকের কাছে পরাজয়বরণ করে আত্মহত্যা করেছিল। এ রকমভাবে বহু মোমিনের সুনিশ্চিত বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো তুলে ধরা যায় : খাজা গরিবে নেওয়াজ, গেসু দেরাজ, খানজাহান আলী, আবুল হোসেন খেরকানি এবং নুর মোহাম্মদ দারবন্দির মতো। মোমিনের জন্য সুনিশ্চিত বিজয়–কোরান-এর এই ঘোষণাটি সামনে থাকা সত্ত্বেও আজ কেন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে আর মারের পর মার খেয়ে চলছে মুসলমান? তা হলে কি আমরা মুসলমান হয়েছি? ইমান এনেছি? আলবাব তথা জ্ঞানী হয়েছি, কিন্তু মোমিন মুসলমান হতে পারি নি। যদি সত্যি মোমিন হতে পারতাম, তা হলে কোরান-এর কথা সত্য হতে বাধ্য। তা হলে আমরা সব রকম ফেরকাবাজি বাদ দিয়ে সব মুসলমান মিলে আমাদের ভুলগুলো কোথায় হচ্ছে তা মিলেমিশে কবে বের করতে শিখব? ফেরকাবাজি করে করে আমাদের মগজ এমনভাবে ধোলাই করে ফেলেছি যে, একসঙ্গে বসার মন-মানসিকতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি।

বরিশালের পীরে কামেল শাহ সুফি বাবা শামসুদ্দিন দেওয়ানের একটি কবিতা পাঠকদের জন্য তুলে ধরলাম। কারণ তিনি প্রথমে শরিয়তের বিরাট আলেম ছিলেন এবং পরে তিনি গালবাতের হালতে থাকতেন। অনেকটা মজ্জুবের মতো। তিনি লিখেছেন, খোদার দিদার যদি চাও মন, ভজ আগে মুর্শিদের চরণ, মানুষ রতন কর যতন, চিনতে যদি চাও আপন। পীর-মোর্শেদ কেবলা কাবা, তার চরণে কর সেবা, অব-তাগু উমিলা ধর, কর তার সাধন ভজন। জাহেরাতে মক্কা কাবা, হাকিকতে হয় মানুষ কাবা, বিশ্বাস কর মোরাকাবা-মোশাহেদায় হয় দর্শন। মোমিনের কলবে খোদা, দম থাকতে হবে না জুদা, যথা মোর্শেদ তথা খোদা, বিশ্বাস কর জিন-এনছান। আগে তুমি মোর্শেদকে মানো, তারপরেতে নিজেকে চিনো, কোরান-হাদিস আমল কর, খোদা রয় গোপন। ছহি হাদিসে করে বয়ান, একজন খাঁটি মুসলমান মক্কা কাবা হইতে উত্তম, সদায় কর তাহার স্মরণ। অহংকারী দেমাক ছাড়ো, জায়গা চিনিয়া সেজদা করো, আগে নিয়ত ঠিক করিয়া লও, মানুষ ছাড়া খোদা নাই।

সুফিবাদের মূল এবং একমাত্র লক্ষ্যটি হলো এলমে লাদুনি হাসিল করা। এলমে লাদুনি কলবে থাকে, সিনায় থাকে। মাথায় থাকে না। মাথার জ্ঞানের মূল্য যদিও অনেক বেশি, তবে মাথার জ্ঞান দিয়ে এলমে লাদুনি হাসিল করা যায় না। মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটানো যায় মাথার জ্ঞান দিয়ে। পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে চলছে মাথার জ্ঞান। মাথার জ্ঞান দিয়েই বিজ্ঞানের অনেক রকম চমক দেখে চলছি এবং এই দেখার শেষ হতে পারে পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে গেলে। সুতরাং কোনো বিষয়েরই শেষ সিদ্ধান্তটি দেওয়া যায় না। তবে মাথার জ্ঞানটি অর্জন করা এলমে লাদুনি হাসিল করার চেয়ে অনেক সহজ। কারণ এ যুগে সব রকম সাধনপদ্ধতি জেনে একটানা নির্জন সাধনাটি করতে খুব কম লোকই এগিয়ে আসে। তার উপর এই নির্জন সাধনায় দুনিয়াবি চাকচিক্য পাওয়া তো দূরে থাক, বরং সব কিছুই হারাতে হয়। ধনসম্পদ উপার্জন, ক্ষমতার কর্ণধার হওয়া, জাগতিক মানসম্মান অর্জন ইত্যাদিতে প্রায় সব মানুষই কমবেশি ডুবে যেতে চায়। তাই এলমে লাদুনি হাসিল করার সাধনাটি করতে চায় না। তবে অনেকে রথও দেখতে চায়, আবার কলাও বেচতে চায়। এই প্রকার মানুষগুলো যখন সুফিবাদে আসে তখনই সুফিবাদে কমবেশি ভেজাল ঢুকতে শুরু করে দেয়। এই রকম মানুষগুলো সুফিবাদের দুয়ারে পায়খানা-পেশাব করে দেয়। সুফিবাদের শরীরে ধর্মীয় শাস্ত্রকথার এত জমকালো অলঙ্কার পরাতে থাকে যে, অবশেষে আসল সুফিবাদটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন সুফিবাদের নামে নানা রকম ধর্মীয় শাস্ত্র কথার দোহাই দিতে দেখা যায়। এই সেদিন বাংলাদেশের এক বিখ্যাত ওলির মাজারে বাৎসরিক ওরসে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। নামটি ইচ্ছে করেই গোপন রাখতে চাই। কারণ সুফিবাদের উপর সেই বিখ্যাত ওলির মহামূল্যবান কয়টি বই পড়েছিলাম। তিনি তাঁর রচিত একটি বইতে লিখেছেন যে, আমার পীর সাহেবের দরবারে সব সময় কাওয়ালির সামা মাহফিল হতো। ভালো ভালো কাওয়াল আসত। সেই কাওয়ালি শুনে জজবায়ে আত্মহারা হতাম। কখনও বেঁহুশ হয়ে পড়তাম। সঙ্গীত যে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে এত প্রচণ্ড ভূমিকা রাখতে পারে তা যারা সঙ্গীত শোনেন না অথবা নাজায়েজ বলে ফতোয়া দেয়, তারা মূল্যায়ন করতে পারবে না। কারণ ধর্মীয় শাস্ত্রজ্ঞান যে মাথার জ্ঞান হতে আগত। মাথার জ্ঞান দিয়ে মাওলানা হওয়া যায়, মোফাচ্ছেরে কোরান (কোরান ব্যাখ্যাকারী) হওয়া যায়, শায়খুল হাদিস হওয়া যায়, মুফতি হওয়া যায়, এজমা-কিয়াস-উসুলের বিরাট আলেম হওয়া যায়, ইসলামের ইতিহাস-জানা বিরাট পণ্ডিত হওয়া যায়, কিন্তু এলমে লাদুনি, এলমে কাল্‌ব, এলমে মারেফত, এলমে আসরার হাসিল করা যায় না। কারণ এলমে লাদুনি যে মাথার জ্ঞান নয়, ইহা সিনার জ্ঞান। আর সিনার জ্ঞান হাসিল করতে হলে নির্জনবাসের মধ্য দিয়ে সাধনা করে অর্জন করতে হয়, যা মহানবি তাঁর নিজের জীবনে করে দেখিয়ে গেছেন। কারণ তৌহিদের শিক্ষাটি হলো, আগে নিজে মিষ্টি খাবার অভ্যাসটি পরিহার করতে শিখো, তারপর অপরকে উপদেশ দাও। অথচ শুনে অবাক হবেন বাংলার এই বিখ্যাত ওলি সম্ভবত আঠারো শত চুরানব্বই সালে দর্শন শাস্ত্রে এমএ পাস করেছেন। আমাকে যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বললেন যে, যদিও আমার পীর সাহেব কাওয়ালি শুনতেন, কিন্তু আমার মোল্লা পীরভাইয়েরা কাওয়ালি নাজায়েজ ফতোয়া দিয়ে একদম বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি হেসে বললাম, এই বিজ্ঞানের যুগে এই ফতোয়াটিকে আর কতদিন টিকিয়ে রাখতে পারবেন? আপনাদের ঘরে জায়েজ, আর ওরসে নাজায়েজ! এই তো আপন পীরকে অনুসরণ করার চমৎকার নমুনা। অবশ্য বিজ্ঞানের দাপটে এই নমুনাটিও পদ্মার মাটি ভাঙার মতো বিজ্ঞানের পদ্মায় একদিন তলিয়ে যাবে।

আমরা অনেক সময় সিনার এলেম এবং মাথার এলেমের বিরাট পার্থক্যটি করতে পারি না অথবা মনের অজান্তে দুটোকে এক করে ফেলি। অবশ্য এ রকম করাটা একদম স্বাভাবিক। কারণ যারা পার্থক্য করতে পারেন না তারাও তো মাথার এলেম অর্জন করেই পার্থক্য করেন। এটা একদম একটি পরিষ্কার বিষয় যে, ইসলামের বিরাট ঐতিহাসিক, ইসলামিক স্টাডিজের আন্তর্জাতিক মানের অধ্যাপক তথা শিক্ষক, অনেক কোরান-তফসির জানা ঝানু মোফাচ্ছেরে কোরান (কোরান-ব্যাখ্যাদানকারী), অনেক হাদিস গ্রন্থ পড়ুয়া ঝানু শায়খুল হাদিস কেবলমাত্র মাথার জ্ঞানী। এদের মাথার জ্ঞানের লম্বা বহর দেখে মানুষ সিনার এলেম হাসিল করার আশা করে। অবশেষে কতগুলো সুন্দর সুন্দর প্যাঁচমারা কথাই শেখে। সিনার এলেমের বিষয়টি না পেয়ে বাকি জীবনটা বোবা হতাশায় কাটিয়ে দেয়। মাথার এলেম যে সিনার এলেম হাসিল করার পথে বিরাট দেওয়াল হয়ে পড়ে, একথাটি মহানবি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন: আল-এলমুল হেজাবুল আকবর। অবশ্য মাথার জ্ঞানীরাও অনেক সময় পীর সেজে বসেন এবং পীরালি করেন এবং মাথার জ্ঞানীরা এদেরকে পীর হিসেবে লুফে নেন এবং মুরিদ হন। কারণ তারা মাথার জ্ঞানে উচ্চ শিক্ষিত, বাকপটু এবং কথার নিখুঁত মারপ্যাঁচ জানা ঝানু ওস্তাদ। আর যারা যান তারাও মাথার জ্ঞানে শিক্ষিত। সুতরাং খাপে খাপে মিলে যায় এবং মুরিদ হয়ে যান। এই জাতীয় পীরেরা এবং মুরিদেরা সুফিবাদটিকে গোলকধাঁধা দিয়ে দুর্বল করে ফেলেন। আর পীর সাহেব মাথার জ্ঞানী, না সিনার জ্ঞানী, এটা পার্থক্য করাটাও সহজ কথা নয়। এখানেই তকদিরটি দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যেমনটি চান, সে রকমই তো পাবেন। তাই তো মহানবি বলেছেন, তোমার হৃদয়-পেয়ালায় যে রকম পানি আছে, সে রকমটাই তো ঢালতে পারবে। আর যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ শক্তির পূজারি তাই ঝক্‌মক্‌টাই বেশি পছন্দ করেন এবং মুরিদের সংখ্যা দিয়ে পীর যাচাই করেন। সাধক-ভক্তদের এসব বিষয়গুল নাক-কান খাড়া করে দেখে নেবার ধৈর্য ধারণ করতে হয়। আমার এক বন্ধু ঝানু মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় মুরিদ হয়েছেন? বন্ধু বললেন, বিরাট মুফতি-এ-আজমের (নামটি গোপন করতে হলো) কাছে মুরিদ হয়েছি। বললেন, এত এলেমের দরিয়া যে চমকে যাবেন। বন্ধুটিকে কিছুই বললাম না এ জন্যে যে, তিনি মাথার এলেম আর সিনার এলেমের পার্থক্য করার বিষয়টিতে একদম অজ্ঞ। বাংলাদেশের আবদুহু বাবা সোলায়মান শাহ লেংটা যে সিনার এলেমের সমুদ্র একথাটি কেমন করে বুঝাব? আর বুঝাতে গেলেও যে বুঝতে পারবেন তা মনে হলো না বলে 'বেশ ভালো' বলে চুপ করে রইলাম। মাছ যেমন কারেন্ট জাল দেখতে না পেয়ে আটকে যায় সে রকম অনেকেই সিনার জ্ঞানী মনে করে মাথার জ্ঞানীর ফাঁদে আটকে যায়। এখানেও তকদির। তকদিরের লিখনটি খণ্ডাবার বিধান অধম লিখকের জানা নাই। আমার আর এক বন্ধু হাজি। বার চারেক হজ করেছেন। বললেন, হজ করতে গিয়ে তিন শয়তানকে ইচ্ছামত কঙ্কর মেরেছি। তাতেও মনে শান্তি না পেয়ে পায়ের জুতো দুটো ছুঁড়ে মেরেছি। বললাম, দামি জুতো দুটো ছুঁড়ে মারলেন? বললেন, আমারটা তো সামান্য, কত হাজিরা দামি দামি জুতো ছুঁড়ে মারছে! জুতার ঢিবি হয়ে যায়। আবার হুড়োহুড়িতে চাপা পড়ে কত হাজি মারা গিয়ে সোজা জান্নাতে চলে যায়। বন্ধু আরও বললেন, তিনটি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মেরে অনাবিল শান্তি পেলাম। আমি আসল আর প্রতীকী শয়তানের বয়ানটি করতে গেলাম না। কারণ বন্ধুর মনের বাজারে বিক্রি নাও হতে পারে। মনে মনে ভাবলাম, হায় আল্লাহ্! তকদিরের গায়ে কত চমক।

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি প্রথমে শামসে তাব্রিজকে মাথার এলেম দিয়ে যাচাই করতে গিয়ে নিজের ভুলটি বুঝতে পেরে মুরিদ হয়েছিলেন। যখন সিনার এলেম যে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন বিষয় বলে পরিষ্কার ধারণা করতে পারলেন, তখনই পীরের দেওয়া সাধনায় ডুব দিলেন। সিনার এলেমের রহস্যটি বুঝবার পরই তিনি মসনবি শরিফ রচনা করলেন। চুয়াল্লিশ হাজার আটশত ঊনত্রিশ পঙক্তির বিরাট গ্রন্থ মসনবি। মানুষের রচিত ফারসি ভাষার কোরান বলে ঘোষণা দিলেন এবং বললেন যে, কোরান-এর মূল বিষয়টি তুলে নিয়ে শুকনো হাড়গুলো কুকুরদের জন্য রেখে দিলাম। রুমির ফারসি ভাষায় বর্ণনাটি হুবহু তুলে দিলাম, মান আজ কোরআন মাজারা বরদাস্তাম, এসতে খাওয়া পেশে সাঁগে আন্দাখতাম। 'আমি কোরানের মগজ বাহির করে নিয়েছি আর কুকুরদের জন্য হাড্ডিগুলো ফেলে রেখেছি।' মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি অন্যত্র সিনার এলেমের গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেছেন, ছদ কিতাবো ছদ ওয়ারাক দর নারে কুন, সিনারা আজ নূরে হক গোলজারে কুন। অর্থাৎ 'শত কেতাব এবং শত পৃষ্ঠা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করো। তোমার সিনাকে (পীরের ধ্যান দ্বারা) সত্য নুর দিয়ে ফুল বাগানে পরিণত করো।' মাওলানা রুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, পীরের গোলামি না করলে সিনার এলেম হাসিল করা সম্ভব নয়। কারণ সিনার এলেমের রহস্যটি আজাজিলের জানা ছিল না। আজাজিল মাথার এলেমের ঝানু মহাপণ্ডিত। আর মাথার এলেমে থাকে প্রতিযোগিতা, অহংকার করা গাধার চিৎকার, আর হিংসার কূটনীতির বিষমাখা মার্জিত ভাষা। এর ছোবলে বিবেকের প্রায় মৃত্যু ঘটে। আবার বৈষয়িক মানবসভ্যতারও জনক হলো মাথার জ্ঞান, দেহ আর মনটি মাথার জ্ঞান অর্জন করাটাকেই একমাত্র জ্ঞান বলে মনে করে। এই মনে করাটাই মারাত্মক ভুল। অবশ্য সবার চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। যাদের কাছে কিছুটা হলেও ধরা পড়ে তারা কমবেশি সিনার এলেম বিষয়টি নিয়ে ভাবে। তারপর কিছু লোক সুফিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাই রুমির মসনবির নিরপেক্ষ অনুবাদটি খুবই প্রয়োজন। সাইনবোর্ডের চাপটি ফেলে মসনবি-র অনুবাদটি আজও করা হয় নি। দু-একটা যাও বাজারে পাওয়া যায়, তাও সাইনবোর্ডের উগ্র গন্ধে নিজেদের কথা ঢুকিয়ে দেবার দরুন আসল বিষয়টিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে আমাদের জন্য সুফিবাদের ধারণাটি অর্জন করার জন্য বাংলার রুমি বাউলসম্রাট বাবা লালন ফকিরই যথেষ্ট মনে করি। লালনের পীর সাহেব বাবা সিরাজ সাঁইও নিরক্ষর ছিলেন। লালন নিরক্ষর ছিলেন বলেই তাঁর অনেক মূল্যবান গান হারিয়ে গেছে। একটা ভাষা শেখা, আর জ্ঞান অর্জন করা মোটেই এক বিষয় নয়, তা সেই জ্ঞানটি মাথারই হোক আর সিনারই হোক। যে কোরান লাওহে মাহ্‌ফুজে সংরক্ষিত আছে সেটা কোনো ভাষার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যুৎ তথা ইলেকট্রিসিটির কোনো নিজস্ব রং নাই। যে– বাল্বের রংটি যেমন, প্রকাশটিও সে রকম। প্রকাশটি বাল্বের বিভিন্ন রং-এর কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, কিন্তু বিদ্যুৎ মূলে এক। ডাল ভাঙার পাথুরে যাঁতাকলের কেন্দ্রে একটি ডালও ভাঙবে না। ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু তথা ঝড়ের চোখটিতে কখনোই ঝড় থাকে না। এ জন্যই কেন্দ্রে অবস্থানকারীর গুরু ধরতে হয় না। নবিরা কেন্দ্রে অবস্থান করেন বলে তাঁদের গুরু ধরতে হয় না। কেন্দ্রের মাধ্যমটি কেন্দ্রই। সুতরাং গুরুর প্রয়োজন নাই। কেন্দ্রের বাহিরে যারা, আঘাতটি শুধুমাত্র তাদেরই খেতে হয়। যারা আঘাতে জর্জরিত, তাদেরকেই গুরু ধরতে হয়। গুরু ছাড়া গতি ও পথ পাওয়া যায় না। সুতরাং গুরু ভক্তরা এই কথাগুলো লুফে নেবে। আবার গুরু যারা মানে না তারাই

এই কথাগুলোকে বিষ বলে প্রতিবাদ করবে। তকদিরের কী অপূর্ব দ্বান্দ্বিক দর্শনের আলো-আঁধারি খেলা। যদি ধরে নেই যে, আদম গন্ধম খেলো না; আবার যদি ধরে নেই, আজাজিল আদমকে সেজদা করল॥ তা হলে কী অবস্থাটি দাঁড়াত? দর্শনের শেষ কথাটি যখন লাল শালু কাপড় পরে বাউল দোতারায় গেয়ে ওঠে, যেমনে নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কী দোষ? তখন চমকে উঠি! অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। ভাবি নি এত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে অবশেষে দর্শনের শেষ কথাটি বাউলের ঠোঁটে পাব। এই সহজ-সরল কাঁচাগলা মোমের মতো লাল শালু কাপড় পরা, হাতের দোতারায় সুরের ঝংকার তুলে যখন এই কথাগুলো গাইতে থাকে, তখন কি সেই বাউল জানতে পারে যে, এই দর্শন পবিত্র কোরান-এর সূরা নজমের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতটির ভাবার্থ গেয়ে চলছে। প্রতিযোগিতার জ্ঞানটি যে মাথায় আছে, তাই ছোট-বড় করার পার্থক্যটি শিখেছি। শক্তির পূজা করতে শিখেছি, তাই প্রেমের পূজা আঘাত দিলে টেকে না। কারণ স্থায়িত্বটা খুবই হালকা, একদম নড়বড়ে।

পীর কী এবং পীর ধরা কেন প্রয়োজন

একটা কথা পরিষ্কার করে বলে রাখা ভালো, তা না করলে সাধক ভক্তরা (সাধারণ ভক্তরা নয়) বিষয়টি পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারবে না। আর সেই বিষয়টি হলো এই যে, পীর ধরো। গুরুর ভক্ত হও। কথাগুলো বারবার বলছি। সেই পীরের অবস্থানটি কী এবং কতদিন পীরকে ধরে রাখতে হবে? পীরের অবস্থানটি সাময়িক তথা কিছুদিনের জন্য? প্রশ্ন আসতে পারে যে, পীর কতদিন মুরিদের সঙ্গে থাকবেন? পীর মাত্র তিনটি মোকাম তথা তিনটি ঘর পর্যন্ত থাকবেন। সেই তিনটি মোকাম তথা ঘরগুলোর নাম হলো, মোকামে নাসুত, মোকামে মালাকুত এবং মোকামে জাবরুত। সাধক মুরিদ যখন ধ্যানসাধনার দ্বারা এই তিনটি মোকাম অতিক্রম করতে পারবে তখন সে লাহুত মোকামে অবস্থান করবে। লাহুত মোকামে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিক দিয়ে আপন পীর হারিয়ে যাবেন আর বাম দিক দিয়ে খান্নাসরূপী শয়তান পালিয়ে যাবে। সাধক মুরিদ লাহুত মোকামে গিয়ে দেখতে পান যে, তাঁর পীরও তিনি এবং তাঁর মুরিদও তিনি। এক ছাড়া দুই দেখার অবসান হয় লাহুত মোকামে। এই মোকামে আঁকা তথা প্রভুও থাকেন না, গোলামও থাকে না। এখানে কেবলমাত্র 'আনা' তথা আমিটি থাকে। তাই বাবা জানশরীফ শাহ সুরেশ্বরী এই মোকামে ঢুকে আর তাঁর পীর বাবা ফতেহ্ আলি শাহকে না দেখে নিজেকেই লাহুতের আয়নায় দেখার কথাটি ঘোষণা করছেন। বহু ওলি এই কথাটি বলেছেন, তবে বিভিন্ন ভাষার স্টাইলে। সুতরাং আপন পীরের অবস্থানটি কেবলমাত্র তিনটি মোকাম পর্যন্ত। সুতরাং পীরের মুরিদ হওয়াটা আপেক্ষিক তথা কিছুদিনের জন্য। মোটেই সার্বজনীন নয় তথা সব সময়ের জন্য নয়। অনেকেই মনে করেন যে, আপন পীরকে সারাটি জীবন গলার কান্দা বানিয়ে রাখতে হবে। তবে সাধারণ মুরিদকে তা-ই করতে হবে। কারণ সাধনার কোনো ধার সে ধারতে চায় না। আমার এই কথায় অনেকে হয়তো চমকে যাবেন। কিন্তু যতই চমকান না কেন, যে কথাটি বললাম ইহা অপ্রিয় এবং তিক্ত সত্য কথাটি বললাম। সাধক মুরিদ যখন মোকামে লাহুতে ঢুকবেন, তক্ষুনি আমার কথাগুলো যে বর্ণে বর্ণে সত্য কথা সেটা বুঝতে পারবেন। এর আগে সংশয়, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি মনের মাঝে উঁকিঝুঁকি মারবে। শক্তির পূজা করাটা প্রতিটি মানুষের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। সাধকের চৈতন্য বিষয়টি যখন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় তখনই বুঝতে পারে এবং মনে মনে লজ্জা পায়। কারণ শক্তির পূজারক দুনিয়াতে কিছু পেতে চায়, আর প্রেমের পূজারিকে অনেক কিছু স্বেচ্ছায় হারাতে হয়। শক্তির পূজারকের অনেক রকম কন্ডিশন (শর্ত) থাকে, কিন্তু প্রেমের পূজারির কোনো কন্ডিশন তথা শর্ত থাকে না। প্রেমের পূজারি যত সামনে এগিয়ে যেতে থাকে বৈষয়িক মোহ-মায়ার জাল ততই ছিন্ন হতে থাকে। মুরিদেরা যদি গুরুকে বৈষয়িক ঠমকের চমকানো ধনরত্নে সুশোভিত করে, তো সমাজ দেখতে পায়। না হলে সবার অজান্তে প্রেম সুবাস ছড়িয়ে হারিয়ে যায়। আপন পীরকে সমাজের বুকে তুলে ধরার দায়িত্বটি মুরিদের এবং মুরিদেরা প্রাণপণ চেষ্টা কমবেশি করে যান। বহু মজ্জুব ওলিকে ভক্তরা সমাজের কাছে তুলে ধরতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং করেন। হয়তো এ উদাহরণটি না তুললেও সবাই কমবেশি বুঝতে পারেন। অনেক মজ্জুব ওলি জীবনে একটিও মুরিদ করে যান নি, কিন্তু ভক্তরা অপূর্ব সাজে তাঁর মাজারটি সাজিয়েছেন এবং প্রতিবছর দু-একবার ওরসের আয়োজনটি বেশ ধুমধাম করেই করে যাচ্ছে। যারা আজাজিলের মতো আদমের মাধ্যমটিকে অস্বীকার করে, এ রকম কর্মকাণ্ডে তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায় এবং সমাজটিকে নানা প্রকার দোহাই ও ভুয়া দলিল দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিছু বিভ্রান্ত হয় এবং আজাজিলের মতো মাধ্যমটিকে অস্বীকার করে মনের অজান্তে ওহাবিতে পরিণত হয়। কেয়ামতের কর্মফল যে ভোগ করতেই হবে, কারণ কেয়ামত নির্দিষ্ট তকদিরটি দিয়ে ধরাধামে পাঠিয়ে দেয়।

আমরা একটি বিষয়ে বিরাট ভুল করে বসি আর সেটা হলো, বিজ্ঞান ও এলমে লাদুনিকে এক করে ফেলি। মনে করি দুটো একই বিষয়। কিন্তু আসলে দুটো বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। কোরান অনেকবার একথাটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেবার পরও ভুলটি করে বসি। সূরা বাকারার একশত চৌষট্টি নম্বর আয়াতটি ভালো করে বারবার পড়ে দেখুন তো! দেখতে পাবেন প্রতিটি বিষয়কে আলাদা করে দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়টিকে অনেক ভাগে ভাগ করা যায়। প্রতিটি ভাগের জ্ঞান অর্জন করাটা বিশেষ জ্ঞানীর প্রয়োজন। চিকিৎসাবিজ্ঞান একটি বিষয়, আবার চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। প্রতিটি শাখাপ্রশাখার জন্য রয়েছে বিশেষ জ্ঞানী। এ রকমভাবে দুনিয়াতে কত যে বিষয় আছে আর আছে সেই বিষয়টির শাখাপ্রশাখা। প্রতিটি বিভাগের জন্য রয়েছে বিশেষ জ্ঞানী। এত কিছু জানবার পরও আমরা এলমে লাদুনির সঙ্গে বিজ্ঞানের হাজারও বিষয়ে হাজারও শাখাপ্রশাখার বিভাগগুলোকে এক করে ফেলি। এটা যে একটা মারাত্মক ভুল করা হচ্ছে, তা আমরা ইচ্ছা করেই বুঝতে চাই না। এলমে লাদুনির কাছে আমরা কৃষিবিজ্ঞান বিষয়টি জানতে চাই। আমরা জানতে চাই খেজুর গাছের ফলন কেমন করে বেশি ফলানো যায়। এটা এলমে লাদুনির বিষয় নয়। হারুত-মারুত, লবিদ আর ডেভিড কপার ফিল্ডের জাদুবিদ্যাটি এলমে লাদুনির বিষয় নয়। তবু আমরা জানতে চাই। এ জন্যই 'ফালাক' আর

'নাস' নামে আল্লাহ্ কালাম পাঠান। তবুও চাই। তাই শুরু হয়ে যায় সুফিবাদের নামে খনকারি, তাবিজ লিখা এবং আরও এটা-সেটা। এদের দেওয়া চুন খেয়ে ভয়ে অনেকের সুফিবাদের উপর বিশ্বাসটি হালকা হতে শুরু করে। আফ্রিকার রাক্ষুসে মাগুর মাছকে মরাপচা খেতে দেখে ঘৃণায় শরীরটা রি রি করে ওঠে। তারপর দেশি মাগুর মাছ জানা সত্ত্বেও আর খেতে পারে না। রুচিতে বিশ্রী স্মৃতিটা ভেসে ওঠে। কারণ রুচির সবুজ সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ কোনো কিছুই খেতে চায় না। এলমে লাদুনি যিনি হাসিল করেছেন তার কাছে জানতে চাই, পৃথিবী হতে সূর্য কত দূরে। জানতে চাই, সাগরে লবণ এলো কেমন করে। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘোরে, না পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘোরে। ভূমিকম্প হয় কেমন করে। মেঘ-বৃষ্টি হয় কেমন করে॥ইত্যাদি। এগুলো যে সুফিবাদের বিষয় মোটেই নয়, তা আমরা ভাবতে চাই না।

তা ছাড়া সিনার এলেম খুবই সহজ-সরল। অনেকটা শিশুর মতো। তাহাতে কোনো প্রকার প্যাঁচঘোচ থাকে না। তবে তাকিয়া অবশ্যই থাকে এবং থাকবে। তাই ইসা নবি বলতেন যে, শিশুর মতো না হলে আল্লাহ্ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে দেবে না। অথচ মাথার জ্ঞানীরা যতই মার্জিত ভদ্র হোক না কেন, প্রতিযোগিতার কিছু না কিছু তাহাদের মধ্যে থাকবেই। অহংকার কিছু না কিছু থাকবেই। সুতরাং শয়তান খান্নাসরূপ ধারণ করে কমবেশি অবস্থান করবেই। তাই বলছি, মানব সভ্যতার জাগতিক রূপটি যা দেখতে পাই তা শয়তানের অবদান। আমার এই কথায় কিছু লোক চমকে উঠবেন। কিন্তু গভীরে গিয়ে ভেবে দেখুন তো, কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্য কি-না? পৃথিবীটাকে কত রূপে সাজিয়ে তোলার প্রতিযোগিতা, কত কিছু অবাক করা আবিষ্কার, কত দুর্গম পথে জীবন বাজি রেখে অগ্রসর হবার অদম্য অভিলাষ। যেমন সব কিছু ছুটে চলছে সামনের দিকে। কোথায় এর শেষ, দেখার প্রবল স্পৃহা। নিজে শেষ হয়ে যায়, আকাঙ্ক্ষাটি দাঁড়িয়ে হাসে। ভবের নাটক এভাবেই চলবে। তবে এটা সত্য যে, একমাত্র বিজ্ঞান বিষয়টির গবেষণার কোনো শেষ নাই। বিজ্ঞান রিপিট (বারবার একই বিষয়) জানে না। রিপিটেশন বিজ্ঞানের ধর্ম নয়। ছুটে চলাটাই বিজ্ঞানের ধর্ম। যেমন আল্লাহ্ নিজেকে জুল জালাল বলেছেন, জুল জালাল কথাটি অপূর্ব। জুলজালাল-এর অর্থটি হলো, এক সেকেন্ডে পৃথিবীতে কোটি কোটি যে রূপটি ফুটে ওঠে তা আর পরের সেকেন্ডে কোনোদিন দেখানো হয় না। নতুন নতুন রূপ, শৈলী, পরিবর্তন আর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ছুটে চলছে। অথচ দুনিয়ার ইতিহাস মাত্র ষোল পৃষ্ঠায় লিখা যায় বললে অনেক বলা হয়। দুনিয়ার অর্থনীতি রাজনীতিগুলো মাত্র আট পৃষ্ঠায় লিখা যায় বললে অনেক বেশি বলা হয়। কথাগুলো যে কতখানি অপ্রিয় সত্য কথা এটা ভাবুকেরাই বুঝতে পারে। ফিল্ম তৈরি করার হাতেগোনা কয়টি ছক থাকে। এই ছকের বাহিরে ফিল্ম বানানো সম্ভব নয়। সংগীতের হাতেগোনা কয়েকটি মাত্রা থাকে। এই মাত্রার বাইরে সংগীত থাকতে পারে না। ভাষা শেখার হাতেগোনা কিছু অক্ষর বা বর্ণ থাকে। সেই অক্ষর বা বর্ণগুলো বাদ দিয়ে সেই ভাষাটি কখনও চিন্তা করা যায় না। হাসি-কান্না দুটো শব্দেই চাওয়া-পাওয়ার কথাটি ফুটে ওঠে। তারপর? স্ট্যাম্প সাইজের ছোট ছবিটাকে আমরা বড় করতে থাকি, কলমের খোঁচায়, ভাষার জাদুতে ছবিটাকে বড় হতে বিরাট এবং বিরাট হতে বিশাল করে ফেলি। গ্লাসের জল, কলসের জল, পুকুরের জল, খালের জল, নদীর জল, তারপর সাগরের জল। ছোট হতে একটু বড়, তারপর বিরাট হতে বিশাল। আল্লাহ্ রুহ-রূপে (নফ্‌স-রূপে নয়) প্রতিটি মানুষ ও জিনের ভেতর অণুরূপে বিরাজ করছেন, এই অণুরূপকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন। এই জাগিয়ে তোলার নামই এবাদত। বাকিগুলো খোলস। জাগিয়ে তুলতে পারলেই সে দেখে যে, সাড়ে তিন হাত সীমাবদ্ধ দেহটির মাঝে যা আছে ঐ বিশাল সাগরেও তাই আছে। 'সোহহং সোহমি' এবং 'আনাল হক' এ শব্দগুলো তখন সাড়ে তিন হাত দেহের মধ্য হতে বেরিয়ে আসে। যাদের দেহগুলোকে অন্ধকার দিয়ে ঢাকা আছে, যাদের দেহগুলো আচার-অনুষ্ঠানের লেবাসে ঢেকে আছে, যাদের দেহগুলো মন্ত্র-তন্ত্র, যপবাণীতে ঠাসাঠাসি করছে তারাই "আনাল হক" শব্দটিকে বরণ করে নিতে পারে না। বরং বিদ্রোহ করে। ঘৃণায় শ্লেষ ছড়িয়ে দেয়। নির্মম ফতোয়ায় নির্মম শাস্তি চায়। তাই তো শূলে চড়েও মহাপুরুষ ক্ষমার বাণীটি শোনায়। বলেন, এরা কী করছে তা নিজেরাও জানে না। বলেন, কন্যা, মানুষরূপী অসুরেরা কোনোদিন কোনো কালে দেবতাকে গ্রহণ করে না, তাই চলে যাচ্ছি। ঘোর বস্তুর পূজারিরা বস্তুকেই সব কিছু মনে করে আর নিজেকে মনে মনে বিরাট জ্ঞানী মনে করে চাপা অহংকারের খুশবু কাঁঠালি চাঁপা ফুলের মতো লুকিয়ে রেখে সুফিবাদের উপর রচিত বইগুলোকে দেখে হিহি করে হাসে এবং অন্যকে হাসাতে চেষ্টা করে। যারা শক্তির পূজারি (পূজারি শব্দটি ফারসি শব্দ, হিন্দি নয়) তারা হাসির সহযোগী হয়ে যায়। সরল-সহজ কাঁচাগলা মোমের মতো লাল শালু কাপড় পরে দোতারা হাতে যখন গেয়ে ওঠে, তুমি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি তখন এত দর্শনবিদ্যা একদম বেকার রপ্ত করেছি বলে মনে হয়। আর মনে হয় সূরা নজমের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতটি ঐ সরল বাউলের জানা ছিল না।

অনুষ্ঠান কখনও ধর্ম নহে

প্রতীকী বিষয় দেখানো যায়। অনুষ্ঠানটিকেই প্রতীকী বলে। অণুপরিমাণ আসল বিষয়টি থাকে বলেই অনুষ্ঠান বলা হয়। আসল বিষয়টি অনুষ্ঠানের অনেক গভীরে থাকে তাই অনুষ্ঠান আসলের আসল রূপটি ধরতে পারে না, ব্যাখ্যা করা বা দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। যেমন, মক্কার তিনটি পাথরের বানানো শয়তান হলো প্রতীকী শয়তান। অনুষ্ঠানের শয়তান। অনুষ্ঠানের শয়তান তিনটিকে অনুষ্ঠানের পাথর মারা যায়। আপন দেহের মাঝে যে শয়তানটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে তাকে পাথর মারব কেমনে? আমরা জানি, ঐ তিনটি শয়তান হলো অনুষ্ঠানের শয়তান। কিন্তু আপন দেহে বাস করা শয়তানটি তো মোটেই অনুষ্ঠানের শয়তান নয়। তা হলে দেহে বাস করা শয়তানটিকে কোন ধরনের পাথর ছুঁড়ে মারব? এ রকম শিক্ষা যিনি দেবেন, তাকেই গুরু বলা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনার গুরুটিকে আসল গুরু মনে করে আমরা অনেকেই বিরাট ভুল করে ফেলি। অনুষ্ঠানের গুরু কেতাদুরস্ত। মুখে খই ফোটে। মনে হয় কত কিছু জানে, আসলে কিছুই জানে না। অনুষ্ঠানের গুরুর কাছে কথার বাক্য পাওয়া যায়। রশিকে (দড়ি) সাপ মনে করে বারবার হাতে নিয়ে ভুল করি। মক্কার তিনটি শয়তানকে যেমন প্রতীকী শয়তান, অনুষ্ঠানের শয়তান বলে জানি, সে রকম মক্কার কাবা ঘরটিও প্রতীকী কাবা,

অনুষ্ঠানের কাবা। কাবা হলো মোমিনের (আমানুর নয়) কাল্‌ব। সুতরাং প্রতীকী কাবার তোয়াফটিও প্রতীকী। ভেতরের কাবার তোয়াফটিও ভেতরের বিষয়। সুতরাং প্রতিটি বিষয়ের দুটো দিক থাকে : একটি প্রতীকী, অপরটি ভেতরের। একটি অনুষ্ঠান, অপরটি অভ্যন্তরীণ। একটি দেখা যায়, অপরটি দেখা যায় না। একটি মূর্ত, অপরটি বিমূর্ত। প্রথমটি চোখে ধরা পড়ে, কিন্তু পরেরটি ধরা পড়ে না। প্রথমটি হাত বাড়িয়ে লুফে নিতে পারি, অপরটির মাথামুণ্ডু বুঝতে কষ্ট হয়। আসলে যে কোনো বিষয়ের ভেতরটি ধরতে ও বুঝতে কষ্ট হয়। যে ব্যক্তি সবচাইতে তাড়াতাড়ি ইফতার করতে পারেন সেই ব্যক্তিটি আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এই কথাটির দ্বারা প্রতীকী ইফতার তথা আনুষ্ঠানিক ইফতারটিকে মোটেই বোঝানো হয় নি এবং কোনো অবস্থাতেই গোঁজামিল দিয়েও বোঝানো যায় না এবং যাবে না। তা হলে এই ইফতারের রহস্যটি কী? তা হলে এই ইফতার বলতে কোন ইফতারটিকে বোঝানো হয়েছে? আজানের সঙ্গে সঙ্গে হালকা পানীয় গ্রহণের ইফতারটিকে এই ইফতারের সঙ্গে তুলনাই করা যায় না। আর আজানের সঙ্গে সঙ্গে খানা তৈরি করে রেডি থাকলেই কি প্রিয় বান্দা হয়ে যায়? আজানের সঙ্গে সঙ্গে খানা খাইলেই কি প্রিয় বান্দা হওয়া যায়? তা হলে তো অলিম্পিকের দৌড় প্রতিযোগিতার মতো কান খাড়া করে থাকতে হয়। আসলে প্রতীকী ইফতারটির মাধ্যমে আসল ইফতারটি বুঝতে হবে। একটি না থাকলে অপরটি বোঝা যায় না। এ জন্যই ইফতার, রোজা, নামাজ, হজ, জাকাত, কোরবানি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের দুইটি দিক থাকে : একটি জাহেরি, অপরটি বাতেনি। জাহেরিটিকে ভালো করে বুঝতে পারলেই বাতেনিটি ধরা পড়ে যায়। ইফতারের মতো চোখে না পড়ার বিষয়টিতেও যে বাতেনি ইফতারটি লুকিয়ে আছে মহানবির এই হাদিসটি আমাদের চোখ দুটো খুলে দেয়। যদি বাতেনি ইফতারটির কথা মহানবির হাদিসে পাওয়া না যেত, তা হলে আমরা বুঝতেই পারতাম না যে, ইফতারের মতো বিষয়টিতেও বাতেনি ইফতার বলে কিছু থাকতে পারে। অধম লিখক এই হাদিসটি জানবার আগেই খাজা বাবার রচিত মাকতুবাত হতে বাতেনি ইফতারের বিষয়টি পড়েছিলাম। খাজা বাবা তাঁর মুরিদ ও খলিফা বাবা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকিকে উপদেশের ভাষায় বলছেন যে, বাবা কুতুব উদ্দিন, প্রথমে ইফতার করতে শেখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাও তারপর দেখতে পাবে রোজা এবং তারপর তো রোজাই রোজা। এখানে রোজা বলতে একটি বিশেষ সময়ের জন্য পানাহার হতে বিরত থাকতে হয়। সে রকম আসল রোজাটি হাসিল করতে পারলে দুনিয়ার সর্বপ্রকার লোভ-মোহ হতে মুক্তি লাভ করা যায়। রোজার জাহেরি এবং বাতেনি বিষয়গুলো কোরান এবং হাদিসের দলিল দিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলার বিখ্যাত ইসলাম গবেষক এবং সুফিসাধক হজরত সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি তাঁর রচিত সিয়াম দর্শন নামক বইটিতে। এই সিয়াম দর্শন বইটি ধর্মীয় গবেষকদের পড়া উচিত বলে মনে করতে চাই। কারণ তিনি ইফতার ও রোজার বিষয়টি কোরান এবং হাদিস হতে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ ফুটিয়ে তুলেছেন। কোরবানির বিষয়টিও একই রকম। পশু কোরবানি এবং আমিত্বের কোরবানি। পশু কোরবানির মধ্য দিয়েই আমিত্বের কোরবানিটি যে আসল এবং মূল কোরবানি, ইহা পরিষ্কার বোঝা যায়। তাই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। পশু কোরবানির মতো যদি কোনো অনুষ্ঠান না থাকত, তাহলে আমিত্বের কোরবানি করার বিষয়টি হয়ে পড়ত সম্পূর্ণ বিমূর্ত। কোরবানির বিষয়টিকোরান-হাদিসের দলিলসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ লিখেছেন বাংলার বিখ্যাত ইসলাম গবেষক হজরত শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি। বইটির নাম কোরবানী।

ইমান বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত লিখা যায়। তবে অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে, গবেষকগণ ইমানকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। ইসলাম গবেষকদের মধ্যে কেউ তিন ভাগ, কেউ দুই ভাগ, কেউ কোনো ভাগ না করে একটি বলেছেন। অবশ্য ইমানের মূল বিষয়টিতে প্রায় গবেষক ঐকমত পোষণ করেছেন। যে ইমানে আল্লাহ্‌র দিদার লাভ করা হয়েছে সেটাই আসল ইমান। এই রকম ইমান চলে যাবার বা বরবাদ হবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ দর্শনের পর আর অবিশ্বাস আসে কী করে? অনুমানের বিশ্বাসে তথা অনুমানের ইমানে অবিশ্বাস থাকাটা স্বাভাবিক। যদি বলে এ বিশ্বাসটি আসতে পারে, তা হলে দর্শনের ইমানটি হয় নি, বরং অনুমানের ইমান হয়েছে। অনুমানের ইমান যতই উন্নত হোক না কেন এবং যতই মার্জিত ও ভদ্র হোক না কেন, উহা অনুমানই। অনুমানের ইমানটি অনুমানই। কোরানের সূরা ইউনুসের একশত নম্বর আয়াতে বর্ণিত ইমানটি দর্শনের ইমান। কারণ আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া ইমান আনা সম্ভব নয়। হজরত ইসা নবির সাহাবারা নবি ইসাকে প্রশ্ন করেছিল এই বলে যে, প্রভু, আপনি মৃতকে জীবিত হও বললেই জীবিত হয়ে যায়, কিন্তু আমরা বললে হয় না কেন? ইসা নবি বললেন, আল্লাহ্‌তে ইমান এনে বলো, দেখবে মৃত তো জীবিত হওয়া সাধারণ বিষয়, বরং এর চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটানো যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, এই রকম ইমানের গভীরতা কয়জনের এবং কতটুকু হতে পারে?

অনেক দিন আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম, অবশ্য আজমির যাবার উদ্দেশে। কিছু বই কেনার জন্য কলেজ স্ট্রিটের লাইব্রেরিতে বই দেখছি, এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক এসে লাইব্রেরির মালিক অথবা কর্মচারীকে বলছেন, দাদু, আজ প্রচুর জল দিয়ে স্নান করেছি, পুরো তিন বালতি জল দিয়ে। আমি অবাক হলাম আর ভাবলাম, আমি খালের জলে গোসল করে প্রচুর শব্দটি ব্যবহার করি না, আর উনি মাত্র তিন বালতি জলে প্রচুর শব্দটি বসিয়ে দিলেন। ভাবলাম, প্রচুর মাত্র একটি শব্দ, কিন্তু গভীরতা এবং ব্যাপকতার বাস্তবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। নবি ইসার ইমানের গভীরতা, আর তাঁর সাহাবাদের ইমানের গভীরতা! একটি সাগর, অপরটি মাত্র তিন বালতি জল। ইমান বিষয়ে কোরান-হাদিস দিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে যিনি অপূর্ব ভাষার শৈলীতে এবং নিখুঁত যুক্তি দিয়ে দুইটি বই রচনা করেছেন আজ হতে প্রায় দেড়শত বছর আগে উর্দু ভাষায়– যাহার অনুবাদ বাংলায় করা হয়েছে, সেই বিখ্যাত বই দুইটির নাম সিররে হক জামে নূর এবং মাতলাউল উলুম– বাংলার মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি যাকে বলা হয়, সেই পীরে কামেল মাওলাউল আলা বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী। এই দুইটি বই পড়লে আপনার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় আর প্রশ্নের অবসান হবে বলে বিশ্বাস করি।

ভাষাটি যে কেবলই ভাবের একটি হালকা বাহন মাত্র। ভাষার ঝানু পণ্ডিত যে জ্ঞানের ঝানু পণ্ডিত কখনোই হতে পারে না এবং কোনোদিন হয় না॥ এই নির্মম সত্যটি সহজে চোখে ধরা পড়ে না। তাই আমরা সংশয় আর জিজ্ঞাসার অনেক রকম রোগযাতনায় ভুগি। ট্যাবলেট-ক্যাপসুল খেয়েও কিছু মনে হয় না। মনে হয় সব কিছু মেইড্ ইন জিঞ্জিরা। ইংরেজি ভাষাটির ঝানু পণ্ডিত সাহেবের সামনে যখন রাশিয়ান, জার্মান অথবা ফ্রেঞ্চ ভাষার ঝানু পণ্ডিত ভাষণ দেন, তখন অবুঝ শিশুর মতো কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। তখনই মর্মে মর্মে বুঝতে পারি ভাষা শেখা আর জ্ঞান অর্জন মোটেই এক বিষয় নয়। ব্রিটিশ জাতি বড়ই চালাক জাতি। মালদহের ফজলি আমের মতো। অন্য স্থানে গাছ রোপণ করলে ফজলি আম হবে সত্য, কিন্তু সেই খুশবু আর

মজাটি পাওয়া যায় না। একই ইলিশ মাছ– সাগর, মেঘনা আর পদ্মার– তিন রকম মজা। ব্রিটেনের মাটি আর বাতাসই এদেরকে ঝানু-চালাক বানায়। ব্রিটিশরা প্রথমে মাতৃভাষা ইংরেজি ফেলে দিয়ে পবিত্র (?) ল্যাটিন ভাষায় লেখাপড়া চালু করেছিল। এতে অনেক ছেলেমেয়ে ফেল করছে দেখে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। তাই ল্যাটিনকে ফেলে মাতৃভাষা ইংরেজি চালু করেছিল। তারা তাদের ভুল পদক্ষেপটি ধরতে পেরেছিল। কিন্তু আমরা? দুইশত বছর ইংরেজদের গোলামি করার গন্ধ তো একটু থাকবেই। ভুল বললাম কি? মনে আঘাত লাগে কি? সামান্য লজ্জা পান কি? বিবেকে সামান্য ধাক্কা লাগে কি? হয়তো লাগবে, হয়তো লাগবে না। ভারতের একজন প্রধানমন্ত্রী তাঁর মেয়েকে উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, ভাষা ভাবের বাহন মাত্র। কঠিন এবং আলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহার করলে সবাই বুঝতে পারবে না। তোমার ভাবটি এই মার্জিত বাহনের জন্য সবার কাছে তুলে দিতে পারছ না। তাই তো বলি, এহতেরাম শব্দটি না লিখে ইজ্জত শব্দটি ব্যবহার করলে সবাই বুঝতে পারবে। এতে তোমার ভাষার ঠমকে হোক না কিছুটা অঙ্গহানি।

'মসজিদুল হারাম তথা কাবা শরিফ হতে বায়তুল মোকাদ্দেসের দূরত্ব কতটুকু?' প্রশ্ন করেছিলেন মহানবির সাহাবারা, মহানবিকে। সঙ্গে সঙ্গে মহানবি বললেন, 'চল্লিশ বছর।' এই হাদিসটি অস্বীকার করার কোনো জো নাই, কারণ ইহা মুত্তাফেকুন হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। যারা বাতেনি অর্থটি কোনো প্রকারেই গ্রহণ করতে চায় না তারা এর ব্যাখ্যা না লিখে বুদ্ধিমানের মতো পাশ কেটে যায়। অথচ এই বাণীটিকে কোনো উপায়েই জাহেরি অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কারণ পায়ে হেঁটে গেলেও কাবা হতে বায়তুল মোকাদ্দাস যেতে বড়জোর মাসখানেক সময় লাগতে পারে। ঘোড়ায় চড়ে অথবা উটের পিঠে বসে যেতে চাইলে আরও অনেক কম সময় লাগবে, আধুনিক যুগের বাস, ট্যাক্সি, ট্রেন অথবা বিমানের কথা না হয় বাদই দিলাম। তা হলে মহানবি সঙ্গে সঙ্গে কেন বললেন যে, কাবা হতে বায়তুল মোকাদ্দাসে যেতে হলে চল্লিশ বছর লাগবে? এই চল্লিশ বছর বলতে জাহেরি সুরতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বাতেনি সুরতে যেতে চাইলে, মহানবির নিজের নবুয়ত হাসিল করার সময়টি ইঙ্গিত দিয়ে বলে দিলেন। কারণ তৌহিদের শিক্ষাটি হলো, নিজের অভিজ্ঞতা এবং আদর্শ দিয়ে উপদেশ দেওয়া। মিষ্টি পরিত্যাগ করে অপরকে উপদেশ দেওয়ার আদর্শ হলো তৌহিদ। তাই মহানবির নবুয়ত পাবার বয়সটি তথা চল্লিশ বছর পর নবুয়ত পাবার কথাটি মনে করিয়ে দিলেন। জাহেরি অর্থে এই হাদিসটিকে কোনো অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায় না। এবং প্রয়োগ করার প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে বাতেনি অর্থটি তথা মারেফতকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়? যদি ধরে নিলাম অস্বীকার জোর করেই করা হলো, তা হলে এই পবিত্র বাণীটির কোনো অর্থই করা যায় না। আর করলেও আজগুবি মনে হতে বাধ্য। কারণ মানুষের শেষ ভরসা হলো নিজের পায়ে হেঁটে যাওয়া। এর চেয়ে ধীর গতিতে অগ্রসর হবার আর কোনো উপায় নাই। একটি মানুষ প্রতি ঘণ্টায় চার মাইল করে হাঁটলে এবং প্রতিদিন মাত্র চার ঘণ্টা করে হাঁটলে কত দিন লাগবে? আগে কাবা হতে বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্বটি বাহির করুন। যদি ধরে নেই, কাবা হতে পাঁচশত মাইল দূরে বায়তুল মোকাদ্দাস, তা হলে দৈনিক চার ঘণ্টা করে হাঁটলে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র একত্রিশ দিন এক ঘণ্টা। হাজার মাইল দূরত্ব হলে লাগবে বাষট্টি দিন দুই ঘণ্টা। তা হলে সাহাবারা প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে মহানবি বলে দিলেন 'চল্লিশ বছর' সময় লাগবে। হাদিসটি আরবি ভাষাসহ অনুবাদ করে তুলে ধরা যায়, কিন্তু এতই পরিচিত হাদিস যে, তার আর দরকার পড়ে না। মহানবির প্রতিটি আদেশ-উপদেশ বাতেনি কথায় তথা মারেফতের গোপন কথায় ভরপুর। মারেফতকে অস্বীকারকারী অনেকেই তাই গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অবশ্য ইহাও তকদির। সুতরাং সমালোচনা চলে, কিন্তু গালি নাই। উপলব্ধির বিভিন্নতা থাকবেই। বিভিন্নতা না থাকলে একপেশে হয়ে যায় এবং একপেশে কোনো মতবাদই পৃথিবীতে বেশি দিন টেকে না এবং প্রকৃতির নিয়মে টেকার কথা নয়। তাই গণতন্ত্র যতই ত্রুটিযুক্ত হোক না কেন, মানুষের বিভিন্ন গবেষণার বিষয়গুলো তুলে ধরা যায়। (কাবা শরিফ হতে বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্ব চল্লিশ বছর, মহানবির এই বিখ্যাত হাদিসটির বিস্তারিত এবং অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাংলার বিখ্যাত ইসলাম গবেষক শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ মসজিদ দর্শন-এ)।

যেমন বলা হয়েছে, রোজাদারের মুখ দিয়ে মেশকাম্বর-এর চেয়ে অনেক বেশি সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। আসলেই কি তাই? হ্যাঁ, অবশ্যই সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জাহেরি উপবাসে কি উৎকট দুর্গন্ধ থাকে, না সুগন্ধ? তা হলে বাতেনি ইফতারের মতো কি বাতেনি রোজার কথাটি বলা হয়েছে? প্রশ্ন করে গেলাম। উত্তরটি আপনিই বাহির করে নিন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে গিয়ে অনেকের কপালে কালো একটি চিহ্ন ফুটে ওঠে। সে চিহ্নটিকে আরবিতে এবং কোরান-এ ভাষায় 'সী-মা' বলা হয়। মহানবির আগের নবিদের উম্মতদের উপরও নামাজ ফরজ ছিল। কিন্তু ওয়াক্তিয়া নামাজের কথাটি নাই। তা হলে তাদের কপালেও নামাজের চিহ্নটি কেমন করে ফুটে উঠবে কথাটি কোরান-এ বলা হলো? কারণ আমাদের মতো তারা নামাজ পড়তেন না তথা ওয়াক্তিয়া নামাজই ছিল না। তা হলে তাদের কপালে সেজদার চিহ্নটি পাবার কথা কোরান-এ আছে এবং সেই চিহ্নটি দেখতে কেমন? কারণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাদের সময় প্রচলিত হয় নি। প্রচলন করা হয়েছে আমাদের জন্য। সুতরাং কপালে কালো দাগ পড়ার কথা আমাদের। তা হলে সেজদার চিহ্নটি ফুটে উঠবে বলার মাঝে কি কপালের কালো দাগটিকে ধরে নেব, না অন্য কিছু? আপনি এই বিষয়টির ব্যাখ্যা যেমন খুশি তেমন লিখুন না কেন, কিন্তু লিখাটি পবিত্র নিয়তে আন্তরিক হতে হবে। আর যদি মনগড়া ব্যাখ্যা লিখেন তো আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। একই স্টিল দিয়ে সার্জন আর কসাইয়ের চাকু তৈরি হয়। দুজনেই কাটে। কিন্তু দুজনের দুরকম নিয়ত। একজন বাঁচানোর নিয়তে, অপরজন গোস্ত বিক্রির নিয়তে। তাই আল্লাহ্ কেবলমাত্র আপনার নিয়তটাই দেখবেন। আর কেউ যদি সব কিছু বুঝে গিয়ে থাকেন, তা হলে তাকে আর বোঝানো যাবে না। কারণ বুঝবার দরজায় যদি সামান্য ফাঁক না থাকে তা হলে বুঝবার বিষয়টি তো দরজায় ধাক্কা খেয়ে ফেরত আসবে। কেউ সব কিছু বুঝে যাবার কথাটি বলে এবং এটা তার তকদির। আবার কেউ অনেক কিছু গবেষণা করার পরও 'সব কিছু বুঝতে পারছি না' বলে এবং এই বলাটাও তার তকদির।

জান্নাতের বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে রূপকতার আশ্রয় নিয়েছেন কি-না জানি না। তবে জান্নাত বিষয়ে কোরান-এ অনেক রকম আরাম-আয়াসের কথা বলা হয়েছে। আবার কোরান-এ একজনের জন্য দুটো জান্নাত এবং এমনকি চার চারটে জান্নাত পাবার কথাটি বলা হয়েছে। অনুবাদক মহাবিপদে পড়ে যায়। ভাবেন, একজন আবার চারটি জান্নাতে থাকবে কী করে? তাই জান্নাতটিকে অনুবাদক জান্নাত না লিখে ফুলের বাগান অনুবাদ করেন। তবুও বলেন না যে, এই দুইটি অথবা চারটি জান্নাত পাবার বিষয়টি বুঝতে পারলাম না। অনুবাদক কোরান-এর সব কিছু পানির মতো বুঝবার

ভান করতে গিয়ে পাঠক ভাইদেরকে কত রকম ডিজাইনের যে লাবড়া পাকিয়ে পাতে তুলে দিচ্ছেন তা পাঠক সরল বিশ্বাসে বুঝতেও পারে না। (কেবল বাংলাদেশ বললে কমই বলা হয়, বরং সমগ্র পৃথিবীতে এই একবিংশ শতাব্দীতে যিনি কোরান-এর সার্থক তফসির কিছুটা হলেও করতে পেরেছেন তিনি বাংলার বিখ্যাত ইসলাম গবেষক শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি। তাঁর কোরান তফসিরটির নাম দিয়েছেন কোরান দর্শন ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড।) বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের তত্ত্বগুলো আজও এদিনে বিজ্ঞানীদের বুঝতে হিমশিম খেতে হয়। কিন্তু কোরান-এর অনুবাদক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অকল্পনীয় রহস্যগুলো পানির মতো বুঝে যান। যে কোরান নিজেই ঘোষণা করছে যে, পানিগুলো কালি, গাছগুলো কলম হলেও কোরান-এর ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না। এই কথাগুলো জানা থাকা সত্ত্বেও কোরান-এর সম্পূর্ণ তফসির লিখা শেষ করে দেন!

পরিতৃপ্ত আত্মার জান্নাতলাভ সম্পর্কে আলোচনা

মহানবি যখন সাহাবাদের বলেছিলেন যে, জান্নাত লম্বা এবং চওড়ায় আকাশ-জমিনে ব্যাপ্ত তখন এক সাহাবা প্রশ্ন করেছিলেন যে, তা হলে জাহান্নামের স্থানটি কোথায়? মহানবি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন এই বলে যে, রাত আসলে দিন কোথায় যায় এবং দিন আসলে রাত কোথায় যায়? এই কথায় কি আমরা এই বুঝতে চাইব না যে, যার জন্য জান্নাত তার জন্য সব কিছুই জান্নাত এবং যার জন্য জাহান্নাম তার জন্য সব কিছুই জাহান্নাম। আপন অস্তিত্বের প্রকাশ এবং বিকাশের উপরই জান্নাত-জাহান্নামটি নির্ভর করে। যিনি জান্নাতি তিনি সর্বাবস্থায় সর্বস্থানেই জান্নাতি এবং যিনি জাহান্নামি সে সর্বঅবস্থায় সর্বস্থানে জাহান্নামী। এত বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েও শারীরিক এবং মানসিক রোগের যাতনা কি ভোগ করতে হয় না! এর চেয়ে জীবন্ত পোড়া কপালটি কি আয়না দিয়ে দেখাতে হবে? গাধার খাটুনি খেটেই চলছে এক অদৃশ্য মরণ নেশায় এবং সবাই জানে যে, দেহনৌকা হতে বিদায় নেবার সময় আর কেউ আপনজন থাকবে না। কেবল অসহায়ের মতো বোবা বিলাপে চিরবিদায় নিতে হবে। জান্নাতের আসল রূপটি আল্লাহ্র ওলিরাও জেনেশুনে বলেন না। হয়তো সমাজ গ্রহণ করে নেবে না বলে তাঁরাও অনেক রকম রূপকতার আশ্রয় নেন। পরিতৃপ্ত নফ্সকেই নফ্সে মোতমায়েন্না বলা হয়। আর নফ্সে মোতমায়েন্নাকেই জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদটি কোরান দান করছে। এখন পরিতৃপ্ত বলতে কী বোঝায়? দেহের ক্ষুধা, পেটের ক্ষুধাটি কি পরিতৃপ্ত নফ্সের থেকে যায়? যদি দেহ-ও পেটের ক্ষুধা থাকে, তা হলে পরিতৃপ্ত বলা হয় কেমন করে? যার কোনো প্রকার চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না তাকেই তো পরিতৃপ্ত বলা হয়। তা হলে এই পরিতৃপ্ত নফ্সের জান্নাতে প্রবেশ করে প্রতিদিন ষাটবার মজাদার খাদ্য খাবার কথাটি আসে কেমন করে? আবার মজাদার খাদ্যই কেবল ষাটবার খাবে না, সেই সঙ্গে অপরূপ হুরদের সঙ্গে প্রতিদিন ষাটবার মিলন করবে? আব্বাসীয় খলিফা মোতাওয়াক্কিল, যিনি ইমাম হোসায়েন-এর মাজার হালচাষ করে নাম-নিশানা মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল, অথচ নিয়তির কী নির্মম পরিহাস খলিফা মোতাওয়াক্কিলের কবরটির নাম-নিশানাও আজ আর নাই॥ সেই বাদশা মোতাওয়াক্কিলের যৌন আনন্দ করার জন্য রাজপ্রাসাদে সাড়ে চার হাজার উপপত্নী ছিল। বাদশা মোতাওয়াক্কিল বলত, এক রাত একটি নারীর সঙ্গে যৌন মিলনের পর বাসি হয়ে যায়। মোতাওয়াক্কিল বাসি পছন্দ করে না। তুলি খাঁর পুত্রধন জনাব হালাকু খাঁ বড়ই নির্মম, বড়ই বেদনাদায়ক শিক্ষাটি কেন যে আব্বাসীয় শেষ খলিফা মোতাসিম বিল্লাহ্, যিনি যৌন জীবনের প্রশ্নে সবাইকে ডিঙিয়ে গেছেন, তাকে শিক্ষা দিয়ে গেল বুঝতে পারি না। সুতরাং পরিতৃপ্ত নফ্স জান্নাতে প্রবেশ করেই অতৃপ্ত হয়ে যাবার কথাটির মাঝে নিশ্চয়ই কোনো গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে যা আল্লাহ্র ওলিরা ভালো করেই জানেন।

ইমানের ধারক বাহক কারা?

কথিত আছে অথবা ইতিহাস বলে যে, হালাকু খাঁ বাগদাদ আক্রমণ করে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি। সন-তারিখের সত্যতা কতটুকু, আমার জানা নাই। তিনশতের কিছু বেশি আপনজন নিয়ে আব্বাসীয় শেষ খলিফা মোতাসিম বিল্লাহ্ আত্মসমর্পণ করে। হালাকু খাঁ সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং এই হত্যার বিষয়টির মুখরোচক কথাবার্তা জানতে পারি। হালাকু খাঁর নির্দেশে ষোল লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়। তারপর হালাকু খাঁ তার খাস চামচার উপর বাগদাদের শাসনভার দিয়ে দেশে ফিরে যাবার পথে কিছুদূর যাবার পর হালাকু খাঁ কিছু লোকজনকে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করল, এরা কারা? কিছু সৈনিক দেখে এসে বলল, প্রভু এরা সংসার ত্যাগী, এরা সন্ন্যাসী, এরা সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য পাবার সাধক। হালাকু খাঁ বললেন, এরা আর কী চায়? উত্তর এল, এরা দুনিয়ার কিছুই চায় না, কেবল স্রষ্টার সন্ধানে মশগুল থাকে। কথাগুলো শুনে ভালোই লাগল হালাকু খাঁর কাছে। বললেন, আমি দুনিয়ার বাদশাহির জন্য এত লোক হত্যা করলাম অথচ এরা বাদশাহি তো দূরে থাক, বরং দুনিয়াই চায় না! বড় অবাক করছে আমাকে। প্রচণ্ড কৌতূহল জাগল। হুকুম হলো, এদের যিনি প্রধান তাকে আমার কাছে আসতে বলো। কিন্তু এই সংসারত্যাগীদের যিনি প্রধান তিনি বললেন, যে আমাকে ডেকেছে, তাকে আমার এখানে আসতে বলো নতুবা চলে যেতে বলো। কথাগুলো শুনে হালাকু খাঁর আরও কৌতূহল জাগল। তিনি নিজেই গিয়ে দেখা করলেন। দেখতে পেলেন, একজন সাধক মাথা নিচু করে চোখ বুজে বসে আছেন। হালাকু খাঁ এক থলি স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন। সাধক প্রশ্ন করলেন, এই থলিতে কী আছে? হালাকু খাঁ বললেন, স্বর্ণমুদ্রা। সাধক বললেন, না এতে স্বর্ণমুদ্রা নেই, আছে কেবল মানুষের রক্ত। চমকে গেলেন হালাকু খাঁ! হাত দিয়ে মৃদু চাপ দিতেই দেখতে পেলেন, একদম টাটকা রক্ত বেরুচ্ছে। তারপর? তারপর আর কী? হালাকু খাঁ সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং মুরিদ হতে চাইলেন। সেই সাধক মহাপুরুষের নামটি হলো হজরত খাজা আবু ইয়াকুব। হালাকু খাঁকে উনি মুরিদ না করে উনারই প্রধান মুরিদ ও খলিফা হজরত

খাজা নুর মোহাম্মদ দারবন্দির মুরিদ করে দিলেন। অনেক ঐতিহাসিক এই সত্য ঘটনাটি এড়িয়ে যান নি। হয়তো বিবেকের দংশনে আহত হয়ে। শিয়া ঐতিহাসিক সৈয়দ আমির আলীও ঘটনাটি নিশ্চয়ই পড়েছেন। কিন্তু তথাকথিত শক্তির পূজারি, শান-শওকতের পূজারি, এলিট সমাজের জার্সি যার গায়ে পরা, ইংরেজি ভাষার আলংকারিক বোম্বাস্টিক শব্দ দিয়ে রচিত বিরাট বিরাট ডিগ্রির নরমুণ্ডু গলায় ঝুলিয়ে প্রজ্ঞাবান (?) ঐতিহাসিক আমির আলি মুসলিম জাতিকে সঠিক ইতিহাস দিয়ে যান নি। এভাবেই অনেক নির্মম সত্য হারিয়ে যেতে চায় ব্যক্তির অপছন্দের উপর নির্ভর করে। কারণ সৈয়দ আমির ছিলেন বহু ডিগ্রিধারী মার্জিত ভদ্র জ্যান্ত শয়তান। ফুসফুস যেমন যক্ষা রোগে খেয়ে খেয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়, জঘন্য শয়তান সৈয়দ আমির আলি সুফিবাদের উপর ভক্তিটিকে কলমের খোঁচায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

একটিবার নিরপেক্ষ মনে ভেবে দেখুন তো! এত বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির হালাকু খাঁকে কেউ আমূল পরিবর্তন করা তো দূরে থাক, সামান্য নরম করার সাহসটি পর্যন্ত কল্পনাও করে নি। অথচ সুফিসাধক বাবা খাজা আবু ইয়াকুব তাকে মুসলমান এবং মুরিদ করে ফেললেন একদম অনায়াসে। ইতিহাস অকপটে কথাগুলো এবং ঘটনাগুলো স্বীকার করে নেয়। কিন্তু রহস্যলোকের বিষয়গুলো বর্ণনা করে না। সে জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, ইতিহাসের ঝানু পণ্ডিত, কোরান-হাদিসের ঝানু পণ্ডিত হওয়া এক কথা, আর আল্লাহ্‌র ওলি হওয়া আরেক কথা। আরও একটু লক্ষ করে দেখুন তো, সেদিনে বাগদাদ নগরীতে অনেকে কোরান-হাদিসের মহাপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু হালাকু খাঁকে মুসলমান বানানো তো দূরে থাক, বরং হালাকুর সৈনিকদের অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে। কত উঁচু মাপের আল্লাহ্‌র ওলি হলে বাবা খাজা আবু ইয়াকুব দেখা করতে না গিয়ে হালাকু খাঁকে আপন খানকাতে এনে মুসলমান এবং মুরিদ বানিয়ে ছাড়লেন। শক্তির পূজারি আর বৈভবের পূজারি আর দুনিয়াবি পণ্ডিত সম্মানের পূজারিরা সুফিবাদের এ রকম রহস্যটিকে বুঝতে পারে না অথবা বুঝবার তকদির তাদের দেওয়া হয় নি। ফুলের মালা গলায় পরে, সেমিনারে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে এলিট সমাজের সামনে বাহবা পাওয়া নামটিকে বিখ্যাত করার নেশায় যারা ডুবে থাকে, তাদের কাছে সুফিবাদের রহস্যের আর কতটুকু দাম হতে পারে? কারণ, এরা ভালো করেই জানে যে, সব বিষয়ে কিছু না কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু সুফিবাদে সব কিছু হারাতে হয়। ইচ্ছা করে সব কিছু হারিয়ে অগ্রসর হবার মন-মানসিকতা খুব কম লোকেরই হয়। খাজা বাবা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতা গিয়াস উদ্দিন চিশতির একটি আঙুরের বাগান আর গম ভাঙার পাথরের যাঁতাকল পেয়েছিলেন। আঙুরের বাগানটি বিক্রি করে দিয়ে সেই অর্থ গরিবদের দান করে দিলেন। আর গম ভাঙার যাঁতাকলটি এক বুড়িকে দান করে দিলেন। তারপর সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন এই বলে যে, হাসান আলামপানার (খাজা বাবার আসল নাম) আর কিছু আছে কি? সবাই নাই বলে সাক্ষ্য দেবার পর খাজা বললেন, এখন পীর ও মুরশিদ খাজা উসমান হারুনি বাক্কার খেদমত করতে চললাম। সব কিছু হারিয়ে খাজা বাবা সব কিছু পেলেন। সেদিনের ভারতবর্ষে মাত্র চার কোটি লোকের বাস ছিল। নব্বই লক্ষ মুসলমান বানালেন। ইমামুল আউলিয়া বাবা বায়েজিদ বোস্তামি বলেছেন, যখন সব কিছু হারাতে পারবে তক্ষুনি সব কিছু পাবে। এটা বৈষয়িক বিষয় নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিষয়। অতএব, সুফিবাদের বইগুলো ছাপিয়ে বিনা মূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে ঘরে ঘরে বিতরণ করার তরে কিছু আর্থিক সাহায্য চাইলে কত শত প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারে আর আমতা আমতা করার দৃশ্য দেখতে হয়! তার উপর সব কিছু হারিয়ে ফেলার দর্শনটি প্রচার করার সাহস! সুফিবাদে না আসুক, কিন্তু একটা ঝাঁকুনি খাক। একটা সামান্য ধাক্কা খাক। মনটা কিছুক্ষণ তোলপাড় করুক সেই আশাটি নিয়ে আর্থিক সাহায্য চাইলে অবশ্যই কিছু না কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। একদম জঙ্গলে কাঁদতে হয় না (অরণ্যে রোদন)। এখনও কিছু মানুষ আছে। এখনও জগতে সুফিবাদের দরদি হারিয়ে যায় নি।

কথিত আছে যে, হালাকু খাঁ খাজা আবু ইয়াকুবের মুরিদ ও খলিফা খাজা নুর মোহাম্মদ দারবন্দির নিকট দুঃখ প্রকাশ করেছেন। হালাকু খাঁ তার সৈন্যবাহিনীকে হুকুম দিলেন যে, আমি মুসলমান। তাই তোমাদেরকেও অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, নতুবা মৃত্যুদণ্ড। মধ্য এশিয়ার বিশাল ভূমি হালাকু খাঁর অধীনে ছিল। ঘোষণা করে দিলেন, হয় মুসলমান হও, না হয় মৃত্যুবরণ করতে হবে। জীবন বাঁচানো ফরজ তাই অনেকেই মুসলমান হয়েছে। অবশ্য বলপ্রয়োগের প্রশ্নটি আসে। কারণ ইসলামে বলপ্রয়োগ নাই। আর তখন তো ছাপানো কোরান-এর প্রশ্নই ওঠে না। সবই হাতের লিখা কোরান, আর হাতের লিখা কোরান কয়টি পাওয়া যেত? বলপ্রয়োগ করে থাকলেও হালাকু খাঁর বিষয়টি হয়তো জানা ছিল না। আবার এমন হিংস্র প্রকৃতির জন্য জানা আর না জানা একই সমান। এ জন্যই হয়তো ঐতিহাসিকরা হালাকু খাঁর এ রকম আচরণটির মূল্যায়ন করেন নি। কারণ গরুর নাকে গোলাপ ফুল ধরলে ঘ্রাণ না নিয়ে খাবার জন্য জিহ্বা বের করবে। যেমন শিশুরা করে। কিন্তু ইতিহাস হালাকু খাঁকে ক্ষমা করে নি, বরং দানবীয় শক্তির প্রতিমূর্তি রূপেই চিহ্নিত করা হয়। শক্তিপ্রয়োগ করে নিজেকে কিছুদিনের জন্য ত্রাণকর্তা রূপে জাহির করা যায়। তারপর ইতিহাস আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেয়। সামান্য একটি দৃশ্য অবশ্য নিজের চোখে দেখেছি। কিছুদিন পাকিস্তানে ছিলাম আইয়ুব খানের আমলে। করাচির বড় বড় সরকারি অফিসে তিনজনের ছবি শোভা পেত : জিন্নাহ, ইকবাল আর আইয়ুব। ফাউন্ডার, ড্রিমার, সেভিয়ার। প্রতিষ্ঠাতা, স্বপ্নদ্রষ্টা, ত্রাণকর্তা। এখন দুটো ছবি শোভা পায় : জিন্নাহ আর ইকবাল। ইতিহাস অপর ছবিটি ফেলে দিয়েছে।

ভক্তি ও ভক্তির প্রকারভেদ

ভক্তি বিষয়টিতে কিছু কথা থেকে যায়। কারণ ভক্তি যদিও একটি বিষয়, কিন্তু দুইটি ভাগে ভাগ করতে বাধ্য হতে হয়। সুতরাং ভক্তি দুই প্রকার : একটি শর্তযুক্ত ভক্তি এবং অপরটি শর্তহীন ভক্তি। যে ভক্তির মাঝে কিছু পাবার শর্ত থাকে সেই ভক্তি কিছুদিনের জন্য তথা আপেক্ষিক এবং যে ভক্তির মাঝে দুনিয়াবি কিছু পাবার শর্ত থাকে না সেই ভক্তি চিরস্থায়ী। যে ভক্তিতে শর্ত থাকে উহার রূপটি কখনও কখনও চাটুকারিতায় পরিণত হয়। অনেক সময় এমনই চাটুকারিতার সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, লোকে তখন ভক্তিটির উপর সন্দেহ করে বসে। অনেক সময় বিষয়টি হাস্যরসে পরিণত হয়। এ রকম ভক্তির

ধমক আর চমক দেখেই খনা বলে ফেলেছিলেন যে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। কারণ যে ভক্তির ভেতর কিছু পাবার বাসনাটি লুকিয়ে থাকে সেখানে চুরি করার মনোবাসনা জেগে ওঠে এবং দিনের আলোর মতো প্রকাশ পায় এবং তখনই ভক্তিটি চোরের লক্ষণ রূপে ধরা পড়ে। এই রকম ভক্তিটি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থ এবং শক্তির অধিকারী হবার প্রশ্নটি আছে বলেই ভক্তিটি অতি ভক্তিতে পরিণত হয় এবং চোরের লক্ষণটি ফুটে ওঠে। ভারতের নামিদামি খবরের কাগজের বিখ্যাত সম্পাদকরা পর্যন্ত এক নেত্রীর প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শন করেছিল তাতে পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানী-গুণীরা চমকে গিয়েছিল। মনে মনে বলেছে, এটা আবার কেমন জাতের ভক্তি প্রদর্শন? লাগামছাড়া ভক্তিটিকে তো বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকরা হার মানিয়ে দিয়েছে এই বলে যে, মহাত্মা গান্ধী এবং গৌতম বুদ্ধের প্রতিমূর্তির মতো সেই নেত্রীর পুত্রের আচার-আচরণ। এবং সেই নেত্রীর পুত্রের সহসা মৃত্যু হলে সব ভক্তি নিমেষেই শেষ হয়ে গেল এবং বিখ্যাত সম্পাদক সাহেবরা আর প্রশংসা ও ভক্তির এক কলাম ইঞ্চিও লিখতে বেমালুম ভুলে গেলেন। এই জাতীয় বিখ্যাত সম্পাদকরা যখন অন্যজনের ভক্তিকে কটাক্ষ করে কলাম লিখেন, তখনি খনা বাবাজির কথাটি মনে ভেসে ওঠে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। সুচ আর চালুনির গল্পটির সার্থকতা এখানেই দেখতে পাই। লাল পতাকা হাতে নিয়ে একদল নেতা যখন অতি বামের স্লোগানে লাফালাফি শুরু করে দেয়, তখন জনতার একটি অংশও তাই করে, বুকভরা আশা নিয়ে। তারপর? কিছুদিন পর যখন অতি ডানপন্থিদের মন্ত্রী হয়ে যান, তখন জনতা হাঁ করে তাকিয়ে ভাবতে থাকে যে, হায়! মুরগির তা দেওয়া ডিম হতে হাঁসের বাচ্চা বেরিয়ে পানিতে নেমে গেছে!

একজন মুসলমান শখ করে ধুতি, গেরুয়া ধরনের পাঞ্জাবি, কাঁধে ব্রাহ্মণের পৈতা, নামাবলির চাদর গায়ে দিয়ে আর কপালে চন্দন মেখে সকালে প্রাতঃভ্রমণে বের হতেন। অপরিচিত হিন্দুরা পথে দেখা হলে ভক্তি করত, অনেক সময় কিছুটা পথ অনুসরণ করত। কিন্তু যখন সকালের নাস্তা খাবার জন্য নাসু মিয়ার গরুর তেহারির দোকানে ঢুকত, তখনই সব ভুল ভাঙত আর চোখ দুটো চড়ক গাছের মতো বিস্ময়ে চেয়ে দেখত নামাবলি পরা সাধুটির আপন মনে গরুর তেহারি সেবা করার দৃশ্যটি। এই জাতীয় ভেজাল ভক্তিটি আমাদের দেশেও হয়তো থাকতে পারে এবং এই ভেজাল ভক্তিটিকেই বলে চাটুকারিতা। আর খনার ভাষায়, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। কিন্তু যেখানে কিছু পাওয়া তো দূরে থাক, বরং দিতে হয় এবং হারাতে হয়, সেখানে ভক্তিটি যতই আবেগে পরিপূর্ণ থাক না কেন, কিন্তু সবটাই খাঁটি সোনার মতো উজ্জ্বল। সেই ভক্তির ভাষা যতই লাগামছাড়া হোক না কেন, যতই ইনিয়েবিনিয়ে ভক্তির চরমে গিয়ে উঠুক না কেন, সেই ভক্তিটি পবিত্র এবং আন্তরিক। কারণ এ রকম ভক্তির মাঝে বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়া থাকে না। থাকে না কোনো প্রকার শর্ত। তাই এ রকম ভক্তিটি কেবল পবিত্রই নয়, বরং মহাপবিত্র। উচ্ছ্বাসের উচ্চতা থাকতে পারে। আবেগের চরম আবেদন থাকতে পারে। কান্নার হা-হুতাসের বিষাদ ধ্বনি মাঝে মাঝে গর্জে উঠতে পারে এই শর্তহীন ভক্তিতে। লাইলির রাস্তার কুকুরের গায়ে মজনু লাইলির গন্ধ পাবার ঘোষণাটির মাঝে বিন্দুমাত্র চাটুকারিতা থাকতে পারে না। কারণ এটাই যে প্রেম। তাই যুক্তির যেখানে কবর, প্রেমের শুরু সেখান থেকে। তাই দেখতে পাই আল্লাহ্‌র ওলিদের ভক্তির অবাক করা ভাষার বিশেষণগুলো। আল্লাহ্‌র ওলিরা ভক্তির নামে চাটুকারিতা করছে এ রকম কথাটি পাষাণ হৃদয়ের মানুষটিও বলে না।

আমি যে ভক্তিটির কথা বলছি সেটা হলো সুফিবাদের ভক্তি। আত্মজিজ্ঞাসার ভক্তি। নিজের পরিচয় জানার সাধনার ভক্তি। এ রকম ভক্তিতে অর্থনীতি এবং রাজনীতির বিষয়টি নাই। সুতরাং চোরের লক্ষণ মার্কা ভক্তিটি থাকার প্রশ্নই আসে না। আমরা অনেক সময় দুটোকে এক করে ফেলি, তাই পার্থক্য করতে পারি না। এতে ভুল করি এবং উল্টাপাল্টা বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করি। অনেক সময় সুফিদের কাছে এসে হিংসাপরায়ণ মানুষটিও সাময়িকভাবে হলেও ভক্তির কাছে মাথা নত করে দেয়। যেমন, হালাকু খাঁ। জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর তো তাঁর পীর ও মুরশিদ হজরত বাবা দরবেশ বন্ধুকে এতই ভক্তি করতেন যে, পুত্র হুমায়ুনের মরণ শয্যায় অনুরোধ করে রাজপ্রাসাদে ডেকে আনেন। এই দৃশ্য দেখে সম্রাট বাবরের পাত্রমিত্ররা চমকে যেতেন। কিছু মানুষ যতই নিষ্ঠুর প্রকৃতির হোক না কেন, সুফিসাধকদেরকে সমীহ করতে ভুলে যায় না। কারণ তারা ভালো করেই জানে যে, সুফিরা দুনিয়ার লোভ-লালসা হতে মুক্ত এবং এঁদের দোয়া আল্লাহ্‌পাকের দরবারে কবুল হয়। মোগল সম্রাট জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর তো ইচ্ছা করে হাত দুটো কয়েদির মতো বেঁধে খালি পায়ে বাবা সেলিম চিশ্‌তির মাজারে গিয়ে দোয়া চাইতেন।

ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের এত বেশি লোভ জন্মাতে থাকে যে, অবশেষে সেই লোভটি ক্যান্সারে পরিণত হয়। ক্যান্সার যেমন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আঠার মতো লেগে থাকে, লোভ-মোহ বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে সে রকম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লেগে থাকে। হাবিয়া নামক তলাবিহীন গর্ত জাহান্নাম তার জন্য অপেক্ষা করে। মৃত্যুর কিছু আগেই একটি মানুষ তখন সব কিছু বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, দেহনৌকা হতে কেবলমাত্র একলা বিদায় নিতে হচ্ছে। যাদের এতকাল আপনজন ভেবে এত গাধার খাটুনি খেটেছি, যাদের জন্য কত রকম অন্যায় কাজ বিবেককে ফাঁকি দিয়ে করেছি, তারা কেউ আর আমার আপন নয়। বারবার সূরা ফজরের কয়েকটা তফসির পড়ে দেখুন, আপনার মনটাকে হয়তো ভাবিয়ে তুলতে পারে, যদি ভাবিয়ে তোলার তকদির আপনাকে দেওয়া হয়ে থাকে। না হলে, সামান্য বুদ্ধিমানের হাসি হেসে কোরান-এর সূরা ফজরটি পড়তে চাইবেন না। কোটি টাকার মালিক হলে শত কোটি টাকার সাধনা করবে। শত কোটি পেলে হাজার কোটি এবং আরও আরও। যেন সীমাহীন চাওয়া, যেন প্রচণ্ড একটি নেশা। মরণনেশা হিরোইনের চেয়েও মারাত্মক। কারণ মরণনেশা হিরোইন সেবন করতে পারলে ফুটপাতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, কিন্তু ধন-সম্পদের নেশা রাতের ঘুম হারাম করে দেয়। অধম লিখক কোটি কোটি টাকা কামিয়েছি, তাই এই নেশার সামান্য অভিজ্ঞতা আমার আছে বৈকি! শত শত কোটি টাকার মালিক। হৃদরোগ হয়েছে। বিড়লা ক্লিনিকে দিব্য শেঠজির বুকফাঁড়া অপারেশন আর পেস মেকার বসানো, তারপরও টাকার নেশায় মশগুল। বললাম, পরকাল? উত্তর, পরেরটা পরে হবে। তা ছাড়া হজ করে এসেছি। হাজরে আসওয়াদে চুমু খেয়ে সব পাপ পরিষ্কার করে এসেছি ইত্যাদি। যেমন হিন্দুরা লাঙ্গলবন্দের জলে স্নান করে বলে ফেলে, বাঁচা গেল। একদম সব পাপ খালাস করে দিয়েছি। প্রায় সব ধর্মে এ রকম ছোটখাটো কথা শুনতে পাবেন যদি সব ধর্ম পড়ে থাকেন। তকদিরের লিখন বলে আপনি এ রকম মহান (?) ব্যক্তিদের থেকে মুখটি ফিরিয়ে নিন। কারণ আজাজিল এদেরকে সাপের ব্যাঙ গেলার মতো গিলে ফেলেছে। এরা আজাজিলের সভ্যতায় সভ্য সদস্য।

বস্তুর বিজ্ঞান ও আত্মার বিজ্ঞানের স্বরূপ

আমরা মাথার জ্ঞান দিয়ে সব কিছু বুঝতে চাই। চাই বলেই সীমাহীন কামনা-বাসনা কলবের জ্ঞানটিকে ঢেকে দেয়। বুঝতেই পারি না যে, কলবের জ্ঞান আবার কী রকম? মাথার জ্ঞানের মধ্যে আজাজিলের নাচন থাকে। উনিশ প্রকার নাচার স্টাইল জানে আজাজিল। তাই মাথার জ্ঞানীরা যেখানেই থাক না কেন, সংঘর্ষ আর যুদ্ধ থাকবেই। বৈষয়িক সভ্যতাটি যতই চকমক করুক না কেন, স্বার্থের যুদ্ধটি আঠার মতো লেগে থাকবেই। মারামারি-কাটাকাটি বৈষয়িক সভ্যতায় থাকবেই। শোষণ, শাসন, জুলুম, অত্যাচার আর মেকি মানবতার গান বৈষয়িক সভ্যতায় থাকবেই। বিজ্ঞান বৈষয়িক সভ্যতাটিকে অনেক দূর এগিয়ে এনেছে। কিন্তু কলবের শান্তিটি দিতে পারে নি। আর কোনোদিন পারবে কিনা জানি না। আল্লাহ্‌র ওলিরা বৈষয়িক সভ্যতাটিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অবশ্যই মনে করেন। কিন্তু কলবের জ্ঞানই শান্তিটি দিতে পারে। কলবের জ্ঞানীরা বৈষয়িক সভ্যতাটির প্রতি অভিনন্দন জানান সত্যি, কিন্তু কলবের জ্ঞান রহস্যটি দিতে পারে না বলেই, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করে নিতে বলে। কলবের জ্ঞানটির সঙ্গে মাথার জ্ঞানটির তথা বৈষয়িক জ্ঞান অর্জন করার প্রশ্নে সামান্য মিল নেই বলে, আমরা দুটোকে মনের অজান্তে এক করে ফেলি এবং কলবের জ্ঞানীর কাছে বৈষয়িক জ্ঞানের নানা রকম প্রশ্ন করে উত্তর পাই না বলে অবাক হতে হয়। আমরা ইচ্ছা করে জানতে ও বুঝতে চাই না যে, মাথার জ্ঞান বৈষয়িক সভ্যতা উপহার দিতে পারে আর কলবের জ্ঞান দিতে পারে শান্তি ও আত্মদর্শন। মানবদেহটিকে বৈষয়িক বিষয়ের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে দিয়েছে যে, দেহটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, সচ্ছল সংসার জীবনটি কাটাতে চাইলে, প্রতি পদে পদে বৈষয়িক জ্ঞান ও সভ্যতার প্রয়োজন হয়। এই বিষয়টি নিয়ে মানুষকে এত ভাবতে হয় যে, কলবের জ্ঞানটিকে মেনে নেবার মন-মানসিকতাটি তখন আর বাকি থাকে না। সবাই কিছু না কিছু কলবের জ্ঞান বিষয়ে কিছু না কিছু সময় ভাবে যখন দেখতে পায় এত কিছু পাবার পরও আরও কিছু একটা পাবার আছে বলে বিবেকটা বারবার খোঁচা মারে। পার-কূল পায় না বলে মনগড়া একটা ধারণা করে ব্যর্থ শান্তি খোঁজে। শান্তি পায় না তবুও শান্তি পাবার ভানটি করে। বৈষয়িক সভ্যতা শক্তির পূজা করতে শেখায় এবং শক্তির পূজা করাটি মাথার জ্ঞানের ধর্ম। তাই দেখতে পাই আল্লাহ্‌র ওলিদের কথা ও উপদেশের বইগুলো বিশ্ববিখ্যাত হলেও চলে খুব কম। হাফিজ, জামি, সামশে তাব্রিজ, খসরু, সানাই, লালন, জগদীশ আর মনোমোহন রচিত বইগুলো কম চলে। অথচ অবাক হতে হয়, একটি দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির স্ত্রীর রচিত স্মৃতিকথার বইটি লেখার ঘোষণা দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশক পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা অগ্রিম দিয়ে বায়না করে রাখে এবং প্রথম প্রকাশের সংখ্যা দশ লক্ষ হবে বলে প্রচার করে। চিন্তা করুন হালকা কতগুলো কথা, স্বামী কেমন বীরপুরুষ, দাম্পত্য জীবনের চুকা-মিঠা কথাগুলো পড়ার কী আগ্রহ! ছাগলের দুই বাচ্চা দুধ খায়, এক বাচ্চা অকারণেই আনন্দে নাচতে থাকে। এই আগ্রহটি জাগিয়ে তোলে বৈষয়িক জ্ঞানের শক্তি। চাওয়া-পাওয়ার কিছু না থাক, কিন্তু শক্তির তো পূজা করা যাবে। এত শক্তির পূজারকদের ভিড়ে কলবের জ্ঞানীদের কথা, উপদেশ ভালো লাগলেও কিছু পাবার থাকে না, বরং হারাতে হয়। তাই মানুষ হারাতে চায় না, বরং কিছু পাইতে চায়। না হয় তো পাবার উৎসাহ এবং ফর্মুলাগুলো এত ভালো লাগবে কেন? অবশ্য বেশ কিছু মানুষ আজও কলবের জ্ঞানীদের কথা ও উপদেশ সাদরে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। দেহনৌকা ফেলে যে চলে যেতে হবে এবং দেহনৌকাটি যে কবরস্থ অথবা পুড়িয়ে ফেলা হবে এটা ভালো করে জানে এবং বোঝে। কিন্তু বৈষয়িক সভ্যতার শক্তিটি এতই প্রবল যে, এর খপ্পরে পড়ে মানুষ সীমাহীন চাহিদার গোলামি করে। বৈষয়িক সভ্যতার ধর্মটি হলো সীমাহীন চাওয়া আর পাওয়ার হিসাব। মরার আগেও বৈষয়িক সভ্যতার হালখাতা শক্ত হাতে ধরেই মারা যায়। বৈষয়িক লোভ-লালসা একটা সুন্দর মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার নজির ইতিহাসের পাতায় ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। নমুনা তুলে ধরলে শেষ হতে চাইবে না। যেমন ধরুন ইতালির মুসোলিনি। উনিশশ' কুড়ি সালের দিকে মুসোলিনি ছিলেন একজন জাঁদরেল সাংবাদিক এবং মানবতাবাদী। ক্ষমতার মোহনীয় শক্তি মুসোলিনিকে কোথায় নিয়ে এলো এবং পরে কোথায় কোন শোচনীয় পতনের শেষ বিন্দুতে একদম অসহায়ের মতো মৃত্যুবরণ করতে হলো! জার্মানির হিটলার একজন ঝানু আর্টিস্ট ছিল, অপূর্ব ছবি আঁকতে পারত। ভিনচি, গঁগা, বুলেন মুয়েল, ইনার জনসন, পাবলো পিকাসোর মতো জগৎজোড়া নাম কিনতে পারবে বলে অনেকেই আশার বাণী শুনিয়েছিল। কিন্তু তারপর? তারপর মানব ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ংকর খুনি বলে সবাই ঘৃণা করে। আল্লাহ্‌র বান্দা ষাট লক্ষ মানুষ খুন করতে হিটলারের বিবেকটি সামান্য কেঁপে ওঠে নি। শক্তির মোহ বিবেককে অন্ধ করে দেয়। পশুর চেয়েও নীচে নামিয়ে দেয়। এক মুহূর্তের তরেও ভাবতে চায় না যে, দেহের ভেতর সামান্য একটি হৃদযন্ত্র ঘড়ির কাঁটার মতো টিকটিক করে চলছে এবং যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেলে বিরাট গর্বিত পোশাক-পরা দেহটি লাশে পরিণত হয়।

শয়তানের অবস্থান কোথায় এবং কীভাবে?

অন্ধ শক্তির মোহটি শয়তান অনেক রকম আশা দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। আর শয়তানের মোহজালে মানুষ এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে মৃত্যুই শেষ পরিণতিটি এনে দেয়। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আল আমিন আমাদেরকে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, বান্দার চাওয়ার কোনো শেষ নাই। যদি দুনিয়াটা পুরোটাই একটি বান্দাকে দিয়ে দেওয়া হয়, তো আর একটি দুনিয়া চাইবে। এ যেন মরুভূমির মরীচিকার মতো। মনে হয় এই তো কাছেই জলের ঢেউ, কিন্তু এ যে মৃত্যুর মেকি জলের নিপুণ ছলনা মাত্র। এই নিপুণ ছলনা শয়তান খান্নাস-রূপ ধারণ করে আপন দেহের ভেতর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে ধোঁকা দিয়ে চলছে। ধোঁকা মনে হয় না এ জন্য যে, ধোঁকাটি বাহির হতে দেওয়া হয় না। কারণ মানবদেহের বাহিরে শয়তান থাকে না॥এটা কোরানের প্রকাশ্য ঘোষণা। দেওয়া হয় আপন দেহের ভেতর হতে। আপন নফ্‌সের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে খান্নাসটিকে। যেমন দুধে জল মেশালে বোঝা যায় না। বিশাল মানবদেহের হৃদয়ঘড়ি জীবনঘড়ির কাঁটা টিক্‌টিক্ করে চলছে আর সেই সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তান মোহের জাল বুনে

চলছে বিবেকটা গ্রাস করার তরে। কিন্তু বুঝবার উপায় থাকে না। জীবনঘড়ির কাঁটাটি থেমে যাবার কিছুক্ষণ আগেই শয়তানের ধোঁকাটি ধরা পড়ে। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকে না। কোরান-এর সূরা হাশরে অকপট বয়ানটি পাই শয়তানের। কিন্তু তখন যে সব কিছু শেষ হতে চলছে। জীবনের অর্থনীতি, রাজনীতি, পারিবারিক বিষয়ের উপর শয়তান সাথেই আছে। এমনকি প্রতিটি চলার ধাপে ধাপে শয়তান কাছেই থাকে, তবু আমরা বুঝতে পারি না। লোভ ও মোহের সুতাগুলো খুবই শক্ত। ছিন্ন করার শক্তি আমাদের থাকে না। কারণ ছিন্ন করার উপায় আমাদের জানা নাই। কেউ শিখিয়ে দেয় নি। শিখিয়ে দেবার গুরু কোথায় পাব? গুরুর বেশেও শয়তান মেকি গুরু সেজে বসে আছে। হেরা গুহার ধ্যানসাধনাটিকে কে শিখিয়ে দেবে? কেমন করে ধ্যানসাধনা করতে হবে সেই সাধনা শেখাবার গুরুটি কোথায় পাব? আসল গুরুর সন্ধান পেলেও অনেক সময় শয়তান রোহবানিয়াতের ধুয়া তুলে পথ ভুলিয়ে দেয়। কারণ শয়তান গুরু মানে না। গুরুকে জানবার বিধান শয়তানকে দেওয়া হয় নি। তাই শয়তান নিজেই গুরু সেজে বসে থাকে। শয়তান আল্লাহ্‌র পূজা করে (সূরা হাশর), কিন্তু গুরুপূজা করে না। আল্লাহ্‌র কাছে শয়তান মাথা নত করে, কিন্তু আদমকে সেজদা দেয় না। আদম কেবল ইনসান নয়, বরং আদম ইনসানে কামেল। আদম নবি ও রসুল। আদম শফিউল্লাহ্‌। আদম-এর ভেতর নুর-এ-মোহাম্মদির জাগ্রত রূপ বিরাজিত। তাই ইনসানরূপী আদমকে মেনে নিতে পারে না শয়তান। শয়তান এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করে না। ওয়াহেদ আল্লাহ্‌কে শয়তান মেনে নেয় এবং সেজদা করে, কিন্তু আহাদ আল্লাহকে শয়তান মানে না এবং সেজদা করে না। সর্বভূতে যে আল্লাহর সিফাত বিরাজিত সেই আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান। সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহকে শয়তান মানে না, তাই আদমকে সেজদা করতে তথা মেনে নিতে অস্বীকার করল। যারা আদমের আনুগত্যকে অস্বীকার করে বলে যে, এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাহাকেও মানি না, তারা ওয়াহেদ আল্লাহ্‌কে মেনে নেয়। আহাদ আল্লাহ্‌ তথা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে মেনে নেয় না। মুখে মেনে নেবার কথাটি বারবার বলবে, কিন্তু সাধনপদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র নুরে নুরময় হবার প্রথাটিকে কিছুতেই মেনে নেবে না। শয়তানের মেনে

নেবার মতো এদের মেনে নেবার হুবহু মিল পাই। তাই মানুষকে প্রতি পদে পদে ধোঁকা খাবার সমূহ বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। লক্ষ লক্ষ ওলি, গাউস, কুতুব, আবদাল, আরিফেরা যুগে যুগে এই একটি মাত্র মূল দর্শনকে নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিমায় প্রকাশ করে গেছেন। ভাষা ভিন্ন, ভঙ্গিমা ভিন্ন, পদ্ধতি ভিন্ন, চমক-ধমক ভিন্ন, নর্তন-কুর্দন ভিন্ন, পথ ভিন্ন, কিন্তু জলে-ভরা সাগর একটাই। মোরাকাবার কৌশল ও পদ্ধতি ভিন্ন, কিন্তু মূল দর্শন একটি। এখানে ধর্মীয় সাইনবোর্ড ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। দেশ-জাত-কালের বিভিন্নতায়, পোশাক-পরিচ্ছদে ভিন্ন হতে পারে, খাওয়া-দাওয়া, চলা-বলার মাঝে ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু মূল দর্শনটি এক ও অখণ্ড (সূরা ইব্রাহিম)। এ জন্যই সুফিরা জাতের মধ্যে বাস করেও জাতের ঊর্ধ্বে বাস করেন। সংকীর্ণতার অন্ধগলিতে সুফিবাদ থাকতে পারে না। তাই নিজ নিজ পোশাকেও অভিন্ন মত ও পথের কথা বলা হয়। খসরু, লালন, কবির, কানাই, জগদীশ, মনোমোহন, দ্বিজদাশ, শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই, বুল্লে শাহ, শাহবাজ, নজমুদ্দিন, ফারমাদি, মটকা শাহ॥ এদের ভাষা ভিন্ন, গান ভিন্ন, সুর ভিন্ন, ঠমক ভিন্ন, শৈলী ভিন্ন, ময়ূখ ভিন্ন, কিন্তু মূল বিষয় অভিন্ন। এরা একই আত্মসমর্পণের সাগরে ঝাঁপ দেবার বাণী শোনায়।

এই আত্মজিজ্ঞাসার বাণী সবার পছন্দ হবে না। সবাই এই আহ্বানে সাড়া দেবে না। এই মহাবাণী, এই মহামন্ত্র যতই কানের কাছে ঘ্যানরঘ্যানর করে শোনানো হোক না কেন, সবাই এর মর্ম এবং মূল্য বুঝতে পারবে না। অল্পসংখ্যক লোক আসবে, আসে এবং এসেছিল॥ মহাকাল এর সাক্ষ্য বহন করে চলছে। এই হেকমতের জ্ঞান তথা রহস্যময় জ্ঞান মাথা খাটিয়ে অর্জন করা যায় না, বরং আতা করা হয় তথা দান করা হয়। কারণ কলবের জ্ঞান, সিনার জ্ঞান তথা এলমে লাদুনি দানের বিষয়, অর্জনের বিষয় নয়। তাই তো কোরান এই বিষয়টির প্রশ্নে 'যাকে ইচ্ছা' দান করার কথাটি ঘোষণা করেছে। যাকে দেবার নয়, দান করা হবে না, তাকে ধ্যানসাধনায় বসতেই দেওয়া হবে না। জোর করে বসতে চাইলেও লাথি দিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হবে। এটা-সেটা বলে অনেক রকম কথার মালা শুনিয়ে, ভয়ভীতি দেখিয়ে যুক্তিতর্কের ধাঁধায় ফেলে ধ্যানসাধনা হতে মনের অজান্তে সরিয়ে দেওয়া হয়, অথচ বুঝতে পারে না। এটাই আল্লাহ্‌র হেকমত। বিশেষ বিধান। বিশেষ কলাকৌশল।

গণতন্ত্রের দেশের এক বিদ্বান ব্যক্তি, যিনি বিরোধী দলে অবস্থান করছেন, তিনি সাধারণ মানুষের সমাবেশে একশত পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলছেন যে, দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী বিবাহ করেন নি, তাই মেঘের দেবতা বরুণ বৃষ্টি দিচ্ছে না। সরকারি দলের এক নেতাকে জানানো হলে তিনি বললেন যে, এই অখাদ্য কথার নিন্দা করার যোগ্যতাটুকুও নাই। তেমনি আমাদের দেশে 'আধ্যাত্মিক' নামটি ধারণ করে অনেক প্রতারক একশত পার্সেন্ট গ্যারান্টির বাণী শুনিয়ে জনতার সাথে প্রতারণা করছে এবং এদের অখাদ্য খনকারিকে আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড বলে সমালোচনা করতেও রুচি ও বিবেক ঘৃণা করে। এসব অপদার্থরা সুফিবাদের উপর প্রশ্ন দাঁড় করাতে চায়। কিন্তু সুফিবাদে বিশ্বাসীরা এদের সামান্য আমল দিতেও ঘৃণা বোধ করে। সুফিবাদে বিশ্বাসীরা ভালো করেই জানেন যে, মোল্লা দিয়ে মহানবিকে মাপতে গেলেই বিরাট ভুল করা হবে। কারণ মোল্লা মোল্লাই, আর মহানবি মহানবিই। যাজক দিয়ে যিশুখ্রিস্টকে মাপতে, খাদেম দিয়ে খাজা বাবাকে মাপতে এবং কট্টর পুরোহিত দিয়ে ভগবান কৃষ্ণকে মাপতে গেলেই বিরাট ভুল করা হবে। সাদা দই দেখে সাদা চুনের কথা মনে করা ঠিক নয়। আর পথের ধারে দড়ি পড়ে থাকাটিকে সাপ মনে করাও ঠিক নয়। ইবলিস অহংকারী, তাই আদমকে সেজদা করে না। সেজদা না করার কত যুক্তি আর দলিল যে ইবলিসের আছে, তা আল্লাহর প্রেমিক দেখতে পেয়ে হাসতে থাকে। ইবলিসের মাথা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো কাছে নত হবে না বলার মাঝে কি স্থূল দৃষ্টিতে ভুল পাওয়া যায়? আরবি-জানা পণ্ডিতের দলও তো এমন কথাটি বলে। তা হলে ইবলিসের দোষটা কোথায়? আরবি জানা পণ্ডিত বলছে, আল্লাহ্‌ ছাড়া মাথা নত করি না। আবার ইবলিসও ঐ একই কথা বলছে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া ইবলিসের মাথা নত হবে না। উভয়ের কথা এক। উভয়ের দর্শন এক। কারণ কোরান হতে অনেক দলিল তুলে ধরা যায় যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করো না। তা হলে? তা হলে এর আসল রহস্যটি কোথায় লুকিয়ে আছে? ওয়াহেদ আল্লাহ্‌ আর আহাদ আল্লাহ্‌র সূক্ষ্ম পার্থক্যটি না বুঝবার দরুন এ রকমটি হতে বাধ্য। 'কুলহু আল্লাহু ওয়াহেদ' তথা 'বলো আল্লাহ এক' বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' 'বলো আল্লাহ্‌ অখণ্ড, একক, স্বয়ং স্বয়ম্ভু সত্তা।' নফ্‌স আর রুহের পার্থক্যটি পরিষ্কার বুঝতে না পারলে যেমন সব কিছু তালগোল পাকানোর গন্ধ পাওয়া যায়,

তেমনি ওয়াহেদ আর আহাদের পার্থক্যটি পরিষ্কার বুঝতে না পারলে এ রকম দশা হতে বাধ্য। ইনসান আর আদম এক বিষয় নয়। কারণ ইনসান হতে নবি ও রসুলের আগমন। তাই বলে সব ইনসান নয়। ইনসানের সুরতই আল্লাহর সুরত, বলা হয় নি। বলা হয়েছে, আদমের সুরতই আল্লাহর সুরত। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি ভালো করে বুঝতে না পারলে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। মহানবিকে ইনসান না বলে বাশার কেন বলা হয়েছে? কারণ বাশার আর ইনসানের মাঝে বিরাট পার্থক্যটি বর্তমান। রুমি, হাফিজ, জামি, সানাই, খসরু, বেদম, হায়রাত, সাঞ্জর, তাবিশ, বাদায়ুনির পীরপূজার রহস্যটা এখানেই। তাই তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে গেছেন, রাফতি ওয়া নেসারে বুঁত পারাস্তে কারদি তথা 'মনেপ্রাণে এবং সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আপন পীরের পূজারি করেছি'। তাঁরা অন্যত্র বলেছেন, 'পীর পারাস্তি হক পারাস্তি' তথা 'পীরপূজাই হলো আল্লাহ্‌র পূজা'। এই কথাগুলো ইবলিস যাদের মাঝে প্রবলভাবে বিরাজ করছে তাদের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেবে। কারণ ইবলিস কোথাও থাকে না এবং থাকার আইন কোরান-এ দেওয়া হয় নি, একমাত্র মানুষ এবং জিনের অন্তর ছাড়া। কারণ আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টি তৌহিদে বাস করছে এবং সব সময় তসবিহ পাঠ করছে তথা গুণগান গাইছে। যাহা তৌহিদে বাস করে তাহাতে ইবলিসের বিচরণ করার অধিকার কোরান-এ দেওয়া হয় নি। সুতরাং ইবলিস মানুষ এবং জিনের মাঝেই মূর্তিমান। কথায় বলে, ইবলিসের যুক্তিতর্ক এবং ফতোয়া সাংঘাতিক ধারালো। এই ইবলিসের ধারালো যুক্তির তলে যাদের মাথা কাটা যাবে তারাও ইবলিসের শিষ্য তথা মুরিদ। দুনিয়াতে ইবলিসের অনুসারীর সংখ্যাই বেশি হবে॥ কোরান-এর পবিত্র বাণী ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখন পাঠক পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে, ওহাবি মতবাদ আর ইবলিসি মতবাদ একই সূত্রে গাঁথা। ওহাবি মতবাদে বিভ্রান্তির মোহনীয় জাল বুনে রাখা হয়েছে আনুষ্ঠানিক কতগুলো প্রার্থনার লেবাসে। আর সেই জালে কত সহজ ও সরল মানুষগুলো পা রেখে ফাঁদে আটকে যাচ্ছে তার হিসাব কে রাখে?

আত্মপরিচয়ের জন্য সাধনপদ্ধতির স্বরূপ

প্রতিটি মানুষের ভেতর রবরূপে রুহ ঘুমিয়ে আছে। অণু-পুরমাণুর চেয়েও ছোট রুহটি বীজরূপে বিরাজিত। ঠাণ্ডা-সর্দির ভাইরাস যেমন প্রতিটি মানুষের মাঝে লুকিয়ে আছে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতো। নবম (নয়) শক্তিতে ওষুধের অস্তিত্ব একদম নাই, অথচ শক্তি আছে। নাস্তি থেকে এর শক্তির অস্তিত্ব। বর্ণহীন এর রং। প্রকারহীন এর আকার। পরিচয়হীনতা থেকে এর পরিচিতি। অবিশ্বাসের মাঝে বিশ্বাস। নাই মনে হয়, তবুও আছের অনুভূতির স্বীকৃতি। মোহনীয় বিত্ত-বৈভবের চমক আর ঠমকের মাঝে একা হয়ে যাবার বোবা কান্না। পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন সবাই আছের মাঝে একদিন একা চিরবিদায় নেওয়া। ধন-সম্পদের লোভ ও নেশা মাদকদ্রব্যের চেয়েও ভয়ংকর নেশা। গাধার মতো খাটুনি খাটায়। কত রকম রঙিন আশার কথা শুনিয়ে, তারপর সব আশাগুলো ধোঁকা দিয়ে একা কেবলই একটা দুনিয়া থেকে নিষ্ঠুরভাবে বিদায় নিতে হয়। সব কিছু বুঝি, বুঝি সব কিছু মায়ার প্রচণ্ড নেশা। বুঝি মাদকের নেশা বিষপান, তবু পান করি। কত সুন্দর সুন্দর রূপের দেহ নিয়ে পৃথিবীটি সেজেগুঁজে নেচে চলছে। আর তাই দেখে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। কত জয়যাত্রা বীরবচন শুনে শুনে দেহ-মনে শিহরণ জাগে। জয়-পরাজয়কে গাজি আর শহিদের কথাটি শুনিয়ে কাছে টেনে আনতে চায়। মানুষ দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং পড়বে। কিন্তু অতি সামান্য অতি নগণ্য কিছু লোক মুখ ফিরিয়ে আত্মপরিচয় জানার সাধনায় ডুবে যায় এবং যাবেই এবং এরাই আল্লাহর ওলি। বাঁধন এদেরকে স্পর্শ করে, কিন্তু বেঁধে ফেলতে পারে না। কাদায় বাস করা মাছের মতো। কাদার স্পর্শে আছে, কিন্তু কাদা মাছের দেহে লেগে থাকে না। নদীতে চলমান নৌকার মতো। জলের স্পর্শ আছে। কিন্তু পেটে পানি ধারণ করে না। সুফিরা আত্মপরিচয় জানবার বারবার তাগিদ দিয়ে চলছেন। সুফিরা দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়ার হিশাবটা ছোট করার বারবার উপদেশ দিচ্ছে এই বলে যে, তুমি দশের সঙ্গে মিশে যেয়ো না, বরং দশের বাইরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে চেষ্টা করো যে, তুমি সম্পূর্ণরূপে এগারো। সম্পূর্ণরূপে আলাদা। বাড়ি-গাড়ি, বিত্ত-বৈভবের মাঝে শান্তি খোঁজার জন্য গাধার খাটুনি খাটছো। হয়তো সব কিছু পেলে। কিন্তু শান্তির পাশেই কাঁটার খোঁচা খাবার যন্ত্রণাটি সব সময় উঁকিঝুঁকি মারার বোবা শব্দটি শুনতে পাচ্ছ? তখন ভুল ভেঙে গেলেও সব কিছু ত্যাগ করে আর এগিয়ে যাবার শক্তি থাকে না। মোহমায়ার মুখে দেহ-মনটি অনেকখানি গিলে ফেলেছে। ছেলেমেয়েদের মাঝে বেঁচে থাকতে চাইছ? কিছুদিন বেঁচেও থাকবে সন্তানদের স্মৃতিতে। তারপর? তারপর নাতিপুতিদের স্মৃতি হতে মুছে যাবে। এই ঠুনকো জীবনটা তোমাকে কিছুই দিল না এবং দেবার বিধান আল্লাহপাক রাখেন নি। যৌন সুখ আর বিত্ত-বৈভবের সুখ যে কত ঠুনকো কাচের মতো তা ভেঙে গেলেই কাচের গ্লাসের টুকরোগুলো দিয়ে যে গ্লাসটি বানানো হয়েছিল তা আর বুঝবার অবকাশ থাকে না। মনগড়া ফতোয়ার বাঁধনে মনগড়া এবাদত করে চলছ? কিন্তু ফলটি যে বিরাট একটি শূন্য তা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে বুঝতে পারবে। মহানবির হেরা গুহার নির্জন সাধনার পনেরটি বছরের কথা হৃদয়ে একটিবার স্থান দিতে পারলে না? একটিবার কিছুদিনের জন্য নির্জন সাধনাটি করতে পারলে না? একটি বার সূরা তওবার দুই নম্বর আয়াতটির আদেশ পালন করতে পারলে না? চারটি মাস দেহের মাঝে ভ্রমণ করার কথাটি বেমালুম ভুলে গিয়ে বিত্ত-বৈভবের নেশায় অমরত্বের ফাঁকি-মারা প্রতারণার খপ্পরে পড়ে মৃত্যুর কাছে এতিম আর সর্বহারার মতো দাঁড়িয়ে রইলে? একগুঁয়েমি, ঘাড়মোগরামি, সব-বুঝে-গেছি, উদ্ধত অহংকারের আস্ফালন যে শেষ পরিণতির দৃশ্যে কত নির্মম, কত নিষ্ঠুর কত বেদনাদায়ক তা হাড়ে হাড়ে টের পাবে। নিতাইগঞ্জের (নারায়ণগঞ্জ শহরের একটি অংশ) মামা রফিক ভূতের মতো পরিশ্রম করত। কোটি কোটি টাকার মালিক। মাঝে মাঝে উপদেশ দিতাম। হেসে উড়িয়ে দিত। অবশেষে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। দেশ-বিদেশের সব চিকিৎসা শেষ। মৃত্যুর পথযাত্রী। মামা বুঝতে পারলেন। দেখা করলাম। হোমিও ডাক্তার হিসাবে অধমের নাম কম ছিল না। তাই শেষ চিকিৎসা চাইল। বললাম, চিকিৎসা লাগবে না, পড়া পানি খান। মামা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। শিশুর মতো। বললেন, বিশ্বাস করো, ভালো হয়ে গেলে তোমার কথা মতো সাধনা করব, সুফিবাদে জীবন উৎসর্গ করব। কিন্তু তা কি আর হয়? নিয়তির অমোঘ বিধানটি যে অবধারিত। এ রকম কত দৃশ্য চিকিৎসকজীবনে দেখতে হয়েছে। মানবদেহটির অনেক রূপক নাম। একটি হলো দেহকেতাব। এই দেহকেতাবটি যতদিন আছে, মনে

হবে সবই আছে। দেহকেতাব কবর অথবা শ্মশানে শেষ হয়ে যায়। কত শক্তিধর দেহকেতাবিদের কথা স্মৃতিতে মলিন হয়ে থাকে। আবার কিছুই থাকে না। সুতরাং কোরান-এর পবিত্র কালামের উপদেশটি কিছুদিনের জন্য মেনে নাও। মাত্র চার মাস দেহের মাঝে ভ্রমণ করতে চেষ্টা করো। মাত্র চারটি মাস তিন ভাগ করে চল্লিশ দিনের নির্জন সাধনাটি করে যাও। দেখতে পাবে কোরান-এর বাণী আর বু আলী শাহ কলন্দরের সাধনপদ্ধতিটি কত বড় ধ্রুব সত্য। এখানে বাকি নাই। এখানে পরে পাবার কথা নাই। এখানে ফাঁকি নাই। সাধনায় পাবার নগদ দৃশ্যটি দেখতে পাবে। এ কথাগুলিও অপ্রিয় সত্য যে, তোমাকে যতই বুঝাই না কেন, যদি তকদিরে না থাকে তা হলে আমার কথাগুলো অখাদ্য বলে মনে হবে। মনে মনে আমাকে যা-তা গালাগালি করবে। বাঘের তকদির নিয়ে যারা আসে তাদেরকে হাতির খাবার সবজি দিলে তো রাগ করাটা একান্ত স্বাভাবিক। আমার এই পুস্তকটি বাঘের তকদির নিয়ে যারা দুনিয়াতে এসেছে তাদের জন্য লিখি নি। তারা যেন ভুল-করা খাদ্যটি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নেবে। কারণ সবজি বাঘের কাছে অখাদ্য। কিন্তু হাতির কাছে খাদ্য। হাতির সামনে বাঘের খাদ্য তুলে ধরলে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কারণ মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটাই হাতির তকদির। এতে দুঃখ পাওয়াটা সবার জন্যই বোকামি। শক্তির পূজারিকে প্রেমের বাণী শোনানো যেমন বোকামি, তেমনি প্রেমপূজারিকে শক্তির বাণী শোনানোটাও বোকামি।

শয়তান উনিশ রকম রূপ ধারণ করে। প্রতিটি রূপের মাঝে থাকে স্থূল আর সূক্ষ্ম প্রতারণার নানা কৌশল। শয়তানের যুক্তি এতই ধারালো যে, বড় বড় মাথাওয়ালারা পর্যন্ত বোকা বনে যায় এবং গেছে এবং এর দলিলও কম পাওয়া যায় না (ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি)। তা ছাড়া শয়তান যে আমারই মাঝে মিশে আছে এবং সূক্ষ্ম ধোঁকার মোহে টোপ ফেলছে তা টের পাবার উপায় সহজেই বোঝা যায় না। শক্তির পূজারিরাও পীর সাজে, গুরু বনে বসে। প্রতিটি বিষয়ে নকল, ভেজাল আর প্রতারণা। সাবধান করেও খুব একটা লাভ হয় না। চোখে আঙুল দিয়ে বোঝালেও অবুঝের মতো পা বাড়ায়। বল্লমের মাথায় কোরান-এর বাণী ঝুলিয়ে হিন্দার ছেলে মোয়াবিয়ার মতো শান্তি চাওয়া। এটা যে সম্পূর্ণ একটা ধোঁকাবাজির স্টাইল তা বারবার মাওলা আলি বলার পরও অনেকেই বুঝতে পারেন নি। বড় বড় ওলিদেরকে অনেকে বুঝতে পারে না। এমনকি বড়পীর গাউসুল আজম মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানিকেও অনেকেই বুঝতে না পেরে ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। মোজাদ্দেদে আলফেসানিকেও। ত্রিভুজের যে তিনটি কোণ থাকে তা একজন অতি সাধারণ বিদ্বানও বুঝতে পারে। কিন্তু উনি ত্রিভুজের দুই কোণ বলাতে অনেকেই ভুল বুঝেছে এবং এই সেদিনও মরহুম ফকির চিশতি নিজামির মতো লিখকও সমালোচনা করতে সামান্য লজ্জা পান নি। এই ত্রিভুজটি কি জাগতিক ত্রিভুজ না অন্য কিছুর রহস্যময় ইশারা লুকিয়ে আছে তা স্থূল দৃষ্টিতে বিচার করে যা-তা মন্তব্য করাটা কি বোকামির পরিচয় বহন করে না? এই একইভাবে পাঞ্জাবের বাবা বুল্লে শাহ এবং সিন্ধের শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই এবং দিল্লির হজরত আমির খসরুকে স্থূল দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে পদে পদে ভুল করা হবে। যারা গাউসুল আজম পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রাব্বানি গাউছে সামদানি শেখ সৈয়দ মাওলানা মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি আল হাসানি ওয়াল হোসায়নিকে শিয়াদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গালিগালাজ করেন তারা ইসলাম বিষয়ের বিরাট পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতর মোকামে অবস্থান করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বড়পীর সাহেব বলেছেন, আমার পায়ের চিহ্ন যে ব্যক্তি মাথা পেতে না নেবে সে কখনোই ফকির হতে পারবে না, বরং হবে একটি ফক্কর। বড়পীর সাহেব বলেছেন, এই সব ফক্করদের থেকে সাবধান! কারণ এরা সত্য পথ হতে বিপথে নিয়ে যাবে এবং গোমরাহিতে লাফালাফি শুরু করে দেবে। মনে হবে এরাই আসল ফকির, অথচ এরাই আসল ফক্কর।

জাঁদরেল সমাজতন্ত্রের নেতার সামনে হঠাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধুয়া তুলে বিভ্রান্ত করেছে জাতিকে একজন প্রজ্ঞাবান নেতা। ম্যাসাচুসেট্সের শিক্ষিত লম্বা চুলওয়ালার 'বৈজ্ঞানিক' কথাটির মাঝে জন ফস্টার ডালেস সাহেবের খুশবু লুকিয়ে থাকার রহস্যটি আমাদের কয়জনের মাথায় ঢুকবে? লেবাসে ধর্মের পোশাক, আসলে ধর্মের ধার যারা ধারে না তারা যদি তৌহিদি জনতার কথা বলে এবং যারা গরিবের রক্তশোষণ করে, এতিমের হক মেরে দিয়ে বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে গণবিপ্লবের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেয়, তা হলে পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে যে, কোথাও খুব বড় রকমের মারাত্মক গলদ দেখা দিয়েছে এবং এটা পরিষ্কার ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। পীর-ফকিরদের মাঝেও নকল, ভেজাল আর প্রতারক দিয়ে দেশ ছেয়ে গেছে। আসল পীর-ফকির চিনে নেওয়াও ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবু আপনাকে খুঁজতে হবে, তবু আপনাকে পীর ধরেও বারবার পীর বদলাতে হবে। কারণ আত্মপরিচয় জানবার নিশ্চিত ফর্মুলাটি আপনাকে জেনে নিতেই হবে। কারণ সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যেমন বৈজ্ঞানিক শব্দটি লাগিয়ে চমক তৈরি করা হয়, তেমনি পীর-ফকিরের নামে 'পীরে কামেল' শব্দটি লাগিয়ে চমক তৈরি করা হয়। যে পীর দুনিয়ার সামান্য অধিকারটি ফেলে দিতে পারে নি, সে আবার ওলি হয় কেমন করে? একই স্টিলের তৈরি দুটি চাকু, একটি দিয়ে অপারেশন করে মানুষ বাঁচায়, আর অপরটি দিয়ে জবেহ করে গোশত বিক্রি করে। আপনাকে খুব সাবধানে চিনে নিতে হবে কোনটা আসল, আর কোনটা নকল। গোয়েবেলস, ডালেস, লিনপিয়াও, মুয়াবিয়া, মারোয়ান, আবু সুফিয়ানদের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে অনেক সরল-সহজ মানুষে ধোঁকা খেয়েছে। এবং আজ বৃত্ত-মার্কা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অন্য রূপ ধরে ধরে অনেক সরল-সহজ মানুষদেরকে ধোঁকা দিয়ে চলছে এবং কতদিন এই শয়তানি খেলা চলবে জানি না। কারণ পবিত্র কোরান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, শয়তান উনিশ রকম ধোঁকা দেবার স্টাইল জানে। সুতরাং সাবধান!

এইসব মহাশয়তান পুরুষদের মধ্যে লিনপিয়াও-এর দর্শনটি এতই মারাত্মক এবং অতি সূক্ষ্ম চিকন ধোঁকাবাজি যে, স্বয়ং মাও সে তুং-এর মতো বিশ্ব জাঁদরেল নেতাদের নেতাও ধরতে পারেন নি। লিনপিয়াও-এর দর্শনটি হলো, একজন মানুষ যতটুকু গুণের অধিকারী, তাকে যদি ধ্বংস করে দিতে চাও তো শতগুণ বাড়িয়ে ইনিয়েবিনিয়ে ভাষার চাতুর্যে প্রশংসার পর প্রশংসা করতে থাকো। আমাদের দেশের কোনো এক নেত্রীর পুত্রকে লিনপিয়াও নামক ভাইরাসে আক্রমণ করতে চাইছে, তবে বুদ্ধিমান হলে হয়তো এহেন ভাইরাস হতে নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবেন বলে মনে করি। জন ফস্টার ডালেস সাহেবের দর্শনটিও মারাত্মক। অনেকটা মরীচিকার দর্শন। মনে হবে দূরে পানি, কিন্তু কাছে এলেই গরম বালু। দর্শনটি হলো, লাল পতাকাটিকে যদি ধ্বংস করে দিতে চাও তো, তুমিও ঠিক সে রকম লাল পতাকা হাতে তুলে নাও। কোনটা আসল আর কোনটা নকল বুঝতে না পেলে জনতা হতাশায় ভুগবে। এতে আসল লাল পতাকাওয়ালা কোনোদিন ক্ষমতায় যেতে পারবে না এবং পাল্লা দিয়ে ব্যাঙ যেমন মাপা যায় না, তেমনি এদেরকে

একজোট করাও যাবে না। কারণ লাফালাফি করলে পাল্লার মানদণ্ডটিও লাফালাফি করবে। সুফিবাদকে ধ্বংস করার জন্য ওহাবিরা নানা কৌশল অবলম্বন করে। তার মধ্যে একটি হলো মারাত্মক কৌশলী সেজে এমন নিখুঁত অভিনয় করতে হবে যে, পাবলিক বুঝতেই পারবে না এবং ঝাঁকে ঝাঁকে মুরিদ হতে থাকবে। এভাবেই ওহাবি মতবাদের ডোজ আস্তে আস্তে মারতে থাকো এবং আসল সুফিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দাও 'বাতেল' শব্দটি ব্যবহার করে। আমরা ছবি তুলি না কারণ ছবি তোলা হারাম, তবে পাসপোর্টের ছবি তোলা হালাল, টাকার মধ্যে আরবি বাদশাহদের ছবি হালাল; আমরা গান বাজনা করি না, কারণ গানবাজনা হারাম ইত্যাদি প্রচার করে আসল সুফিদের থেকে মনটাকে ঘুরিয়ে দাও। যদিও ডালেস সাহেব ছিলেন ঝানু কূটনীতিবিদ। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্নে আসল দার্শনিক নিটশে, শোপেনহাওয়ার, বার্গসঁ, বার্কলি, দেকার্তে আর হেগেল হয়তো অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন। এভাবেই নকল আসলের রূপ ধারণ করে। যুগে যুগে অনেক ধোঁকাবাজির ইতিহাস লেখা হয়েছে, কিন্তু তবুও আমরা আসল-নকল পার্থক্য করতে পারি না এবং একটু সামান্য চেষ্টাও করি না। মাইজভাণ্ডার, সুরেশ্বর, নূরুল্লাপুরের শানাল ফকির, পণ্ডিতসারের গোলাম মাওলানা চিশতি ওরফে শামপুরি শাহ সাহেব, দাগনভূঞার জয়লস্করের শাহাপীর চিশতির দরবারগুলোর পাশেই ডালেস সাহেবের নকল-মার্কা পতাকায় ধর্মীয় বহু কথার বোঝা বহনকারী নকল সুফি দিয়ে দেশ ছেয়ে গেছে। শুধু সামান্য গবেষণা করলেই জীবাণুগুলো ধরা পড়ে যায়। চোখে গবেষণার মাইক্রোস্কোপটি লাগিয়ে পরিষ্কার জলে জীবাণু দেখে যেমন চমকে ওঠে, তেমনি এদেরকে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে অবশেষে মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে অতৃপ্তির চুকা পানি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। এজন্যই মহানবি বারবার আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, আমার আসল উন্মতেরা নকল উন্মতদের এত বেশি বেশি এবাদত-বন্দেগি দেখে দেখে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু এরা জমিনের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী হবে এবং এদের থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে। (মেশকাত শরিফ)।

আমরা অবশ্যই খুব সাবধান থাকতে চেষ্টা করি। কিন্তু বর্ণচোরাদের ফেলে রাখা অদৃশ্য কলার ছোলকায় যে কত অদৃশ্য আছাড় খেয়ে চলছি, তার হিশাবটি কি কেবল তকদিরেরই কলঙ্কের লিখনে হয়ে থাকবে? হায়াত-মউতের মালিক একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। এটা সবাই জানে ও বোঝে। কিন্তু পাঁচতলা হতে ইচ্ছে করে লাফ দিলে কি আল্লাহ্ বাঁচাবেন? না, বাঁচাবেন না। কারণ ভালো-মন্দ যাচাই-বাছাই করার বোধশক্তিটুকু দান করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। পরীক্ষা করার বিষয়টি আছে বলেই তো সমাজ, সংসার এবং ব্যক্তিজীবনে এত জটিলতার জট পাকানো হয়। বই খুলে দিলে তো আর পরীক্ষা থাকে না, বরং নকল হয়ে যায়। আল্লাহ তো ইচ্ছে করলে সব মানুষকে একই উম্মতে আনতে পারেন, কিন্তু তিনি দলে দলে এ জন্যই ভাগ করে রাখেন যাতে পরীক্ষার মাধ্যমে আসল-নকলের পার্থক্যটি করতে পারেন। সূরা হুদে কি এ রকম বাণী পাওয়া যায় না?

পবিত্র কোরান-এর সার্বজনীনতার সাক্ষ্য

শয়তান বিষয়টি পবিত্র কোরান-এ এত সুন্দর এবং স্পষ্ট করে বারবার তুলে ধরা হয়েছে যে, পৃথিবীর কোনো ধর্মীয় গ্রন্থে এ রকমটি আর পাওয়া যায় না। মুসলমান বলে বলছি না, বরং নিরপেক্ষ গবেষণার মাধ্যমে জানা-অজানা বহু ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করেই বলছি। শয়তানটি যে আপন আপন দেহেই অবস্থান করছে, তারই বিশদ এবং নিপুণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একমাত্র কোরান-এই পাওয়া যায়। মানুষ মনে করে শয়তান আলাদা থাকে। এটাই মানুষের মারাত্মক ভুল। তাই শয়তান বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে সুফিবাদে প্রবেশ করার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য মৌখিক শিক্ষা নয়, বরং প্রাকটিক্যাল শিক্ষা। এই বিষয়টি আপন পীর হতে শিখে নিতে হয়। কারণ এই বিষয়টি খুব ভালো করে জেনে রাখতে হবে যে, শয়তানের আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির কোথাও থাকার বিধান নাই, কেবলমাত্র মানুষ এবং জিনের অন্তর ছাড়া। প্রতারণার কেন্দ্রস্থল অন্তরে। মাথায় নয়। মাথা কাজ করে আর অন্তর করায়। চিত্রপরিচালক পর্দার পেছনে থাকে আর নায়ক-নায়িকা বাহিরে থাকে। বাহিরের পরিচিতিটাকে মুখ্য মনে হবে। আসলে তা নয়। শয়তানের স্থানটি যে কেবলমাত্র মানব-অন্তর এটাই কোরান বারবার অনেক রকম ভাষার শৈলীতে বুঝিয়েছে। সুতরাং মানুষ মনে করে সে একা। আসলে একা নয়। শয়তান সঙ্গে আছে বলেই 'উদউনা' তথা দুইজন বলা হয়েছে। আর শয়তানকে সাধনার মাধ্যমে সরিয়ে দিতে পারলে হয় 'উদউনি' তথা একা। তাই সূরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, উদউনি আস্তাজেব লাকুম তথা তুমি একা ডাকো অবশ্যই জবাব পাবে। দুইজন থাকলে হাজার ডাকেও জবাব পাবে না। তথা আপন পরিচয় পাবে না। তাই বারবার নিজেকে চিনতে বলা হয়েছে। তথা তোমার ভেতর তুমি একা নও, বরং দুইজন॥তথা তুমি ও খান্নসরূপী শয়তান। এই খান্নাসরূপী শয়তানকে মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় তাড়িয়ে দিতে হয় নতুবা একা হওয়া যায় না। আর একা না হলে আল্লাহর ডাকের জবাব পাওয়া যায় না। 'আস্তাজেব'-এর মূল শব্দটি হলো 'আল এজাবা' তথা সাথে সাথে জবাব দেয়া। এত ডাকাডাকি করি, কিন্তু জবাব পাবার নাম-গন্ধটিও নাই। কারণ শয়তানকে সঙ্গে নিয়ে ডাকলে 'উদ্উনা' তথা দুইজন হয়ে যায়। অথচ কোরান কেবলমাত্র একা ডাকতে বলেছে, এবং এও বলেছে যে, যদি একা ডাকতে পারো তো সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে। তাই খাজা বাবা হাসান মইনুদ্দিন চিশতি বলেছেন যে, আমি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাই, আর তোমরা পাও না! তোমরাও পাবে, যদি মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় হাস্তি (শয়তান)-কে মিটিয়ে দিতে পারো। মাওলা আলি বলেছেন যে, সেই আল্লাহ্কে আমি কোনোদিন ডাকি নি, যে আল্লাহ্কে দেখি নি। সুফিবাদের এই মহামূল্যবান কথাগুলো অনেকটা বোবা চ্যালেঞ্জ, অথচ এই শয়তানের খপ্পরে পড়ে দুনিয়াটাকেই একমাত্র বিষয় বলে মনে করে নিয়েছি। এই মনগড়া মনে করাটাও শয়তানের নিপুণ ধোঁকা। সূক্ষ্ম প্রতারণা। মৃত্যুর সামান্য কিছু আগেই সব কিছু যে শয়তানের ধোঁকা, পরিষ্কার বোঝা যায়। অনেকটা ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসাবিহীন যন্ত্রণার মৃত্যুর মতো। ঝানু ডাক্তারেরা চেয়ে চেয়ে অসহায়ের মতো মৃত্যু যন্ত্রণার দৃশ্য দেখছে, অথচ করার কিছুই থাকে না। কতটুকু অসহ্য যন্ত্রণা আক্রমণ করে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলছে, এটা একজন সুস্থ লোক কিছুতেই বুঝতে পারে না এবং পারার কথা নয়। কেবল অপরের মৃত্যুযন্ত্রণাটি দেখে বেদনা অনুভব করে। সুতরাং ক্যান্সার ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তথা যার হয়

সেই বোঝে এবং অপরের বোঝার কথাও নয়। তাই আসল সুফিবাদের প্রচার কম হয়। নকল সুফিবাদের প্রচার ও ধুমধাড়াক্কা খুব বেশি। নকল সুফিরা কথায় কথায় শেরেক-বেদাতের গন্ধ পায় এবং কথায় কথায় ফতোয়া মারে। অনেকটা চোরের মায়ের গলার আওয়াজ বড় হবার মতো। আবার এটাও সত্য যে, মিথ্যা, ভেজাল, নকল আর অন্ধকার আছে বলেই মানুষ আলোর সন্ধান করে। কেউ পায়, কেউ পায় না। যার ভেতরের শয়তানটা যে রকম, সে রকমই আশা করতে হয়। শয়তান মনের আকাশে (পৃথিবীর আকাশে নয়, কারণ পৃথিবীর আকাশ তৌহিদে বাস করে) সাধকদেরকে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লাহ্ই হেফাজত করেন। বাস্তব আকাশে শয়তান থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং আগুনের গোলা নিক্ষেপ করাটাও অবান্তর। সুফিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি ফতুহাতে মক্কী নামক কেতাবে বারবার এই কথাটিই বুঝিয়ে গেছেন যে, সামাওয়াতে ওয়াল আরদ্ বলতে আকাশ ও পৃথিবী কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোঝালেও মূলত মন ও দেহটিকে বোঝানো হয়েছে। হজরত আমির খসরু তো স্পষ্ট ভাষায় মন ও দেহটির কথা বোঝানোর কথাটি বলেছেন এবং সেই সঙ্গে এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন যে, সমগ্র সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে পেতে হলে আপন দেহের ভেতরেই আছে এবং পাবে। মোরাকাবার ধ্যানসাধনা বিহনে কেবল এক বোঝা কথা শেখা যায়। লেখাপড়া করে অনেক কিছু জানা যায়, বোঝা যায়, কিন্তু দর্শনটি পাওয়া যায় না। তাই তো অনেক বিশাল বিদ্বান মানুষটিকেও অনেক সময় এত কিছুর ভালোমন্দ জানার পরও আত্মহত্যা করতে দেখি। হেমিংওয়ে সাহেব কি এমনতেমন বিদ্বান! নোবেল পুরস্কারটিও আত্মহত্যা হতে তাঁকে বাঁচাতে পারল না। কী অদ্ভুত শয়তানের প্রতারণার শক্তি। কোথা হতে কোথায় এক মুহূর্তে নামিয়ে ফেলে। যদিও আত্মহত্যা এবং আত্মাহুতি এক বিষয় নয়। এটার ব্যাখ্যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তাই বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী বারবার বলেছেন যে, আগে পথঘাট ভালো করে চিনে নাও, তারপর মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করো।

নূরে হকে হক আছে হক চিনো আগে।
এবাদত পারো যদি করো শেষ ভাগে ॥
না চিনিয়া এবাদত করিবে কাহার।
ভূতের বন্দেগি হবে, হবে না খোদার ॥

আমার লেখা সবার জন্য নয়। যারা কেবল আল্লাহ্র প্রেমিক, যারা কেবল আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে, কেবল তাদের জন্য লিখেছি। প্রেমিক ভালো করেই জানে যে এই পথে কেবল হারাতে হয়, এই পথে নিজেকে বলি দিতে দিতে অগ্রসর হতে হয়। কারণ আমারই মাঝে আরেক নকল আমি লুকিয়ে আছে। যে নকল আমিটি অবিশ্বাস্য ছদ্মবেশ ধারণ করে আসল আমিটাকে প্রতিটি মুহূর্তে ধোঁকার ফাঁদে ফেলছে, সেই নকল আমিটাকে তাড়াতে পারলেই সব সাধনার শেষ হয়ে যায়। তাই তো কোরান বলছে, ইয়াকিন অর্জন না করা পর্যন্ত এবাদত করো। হজরত বাবা দাউদ তায়ি বলেছেন, হাঁটতে হাঁটতে অনেক কষ্ট ও সাধনা করার পর ইয়াকিনের ঘরে প্রবেশ করতে পেরেছি। এখন আর হাঁটার প্রয়োজন নাই। বড়পীর হজরত গাউসুল আজম বলেছেন, আরিফ হবার পর আর এবাদত থাকে না। বায়েজিদ বোস্তামি বলেছেন, নকল আমিটার যখন আর কিছুই রইল না, তখন আসল আমি বলতে লাগল, আমি সুবহানি, সব শান আমারই। শক্তির পূজারিদের কাছে এসব কথা বলতে গেলে গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেবার মতো অবস্থা হবে। কারণ অনেক কিছু পাবার পর এবং যা পেয়েছে তাই খেয়ে শেষ করতে পারবে না তবুও আরও চাই, আরও চাই এবং অবশেষে যে চাই চাই করছে এবং পাচ্ছে, সেই একদিন নাই হয়ে যাচ্ছে। কী অদ্ভুত নৈপুণ্যের শানদার খেলা! সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। এমনকি আস্তে আস্তে মানুষের শেষ সম্বল বিবেকটুকু খেয়ে পশুতে পরিণত হয়ে বসে আছে, কিন্তু কোনো মালুম (টের) পায় না।

মুসলমানদের পতনের মূল কারণ!

আমানতকে মালিকানা মনে করে মুসলমানদের পতনের শুরু হয়। আমানত খেয়ানতকারী হিন্দার ছেলে মোয়াবিয়া হতে এই উত্থান-পতনের ঢেউ খেলে খেলে কোথায় কোন পতনের শেষ ঠিকানায় এসে দাঁড়িয়েছি যে, জংলি মতবাদ সাম্যবাদের লেবাসে কমিউনিজমটিকে দেখতে হচ্ছে, আর স্ট্যালিনকে মহাপুরুষ হয়ে যাবার ঝানু কবিতা শুনতে হচ্ছে। এর চেয়ে সাংঘাতিক অপমান আর কী হতে পারে? অবশ্য এটাও সত্য যে, আসল মামা মারা গেছে তাই কানা মামা স্ট্যালিনের গীত শুনতে হচ্ছে। 'ভূগোল বদলিয়ে ফেলতে হবে', 'এখন ফুলের খেলা নয়', 'ফুল থাকা না থাকায় কি আসে যায়, বসন্ত তো আছেই'॥ইত্যাদি উঁচু ঝংকারের গান শ্রবণ করতে হয়। যারা এই গানগুলো গাইছে তাদের দোষ, না যারা এই গানগুলো গাইবার সুযোগ ও ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে তাদের দোষ? বুকে হাত রেখে বিবেকটিকে প্রতারণা না করে উত্তরটি চাইতে গেলে ভীষণ লজ্জায় আপনার-আমার মাথাটি কি নীচু হতে চাইবে না? যদি বলেন, হ্যাঁ॥তা হলে এটা আপনার তকদির। যদি বলেন, না॥তা হলে এটাও আপনার তকদির।
কোরান বলছে, আকাশ এবং জমিনে যা কিছু আছে সবাই তসবিহ পাঠ করছে। তৌহিদে বাস করলেই তসবিহ পাঠ করা যায়। তাই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তৌহিদে বাস করছে। যাহা তৌহিদে বাস করে, শয়তানের সেখানে আসার প্রশ্নই ওঠে না। তাই শয়তানের থাকার কোনো স্থান নাই। সামান্য পরিমাণ স্থানও সৃষ্টিজগতে নাই যেখানে শয়তান থাকতে পারে। শয়তান যেখানে থাকে তৌহিদ সেখানে থাকে না। শয়তান ও তৌহিদ পাশাপাশি থাকার কোনো আইন সমগ্র কোরান-এ নাই। তাই আমরা দেখতে পাই যে, শয়তান কেবলমাত্র দুইটি স্থানে থাকে এবং থাকার অনুমতি আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়েছে।

সেই স্থান দুটোর নাম হলো জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তর। এই দুইটি অন্তর ছাড়া শয়তান আর কোথাও থাকার অনুমতি পায় নি। তাই আমাদেরকে সব সময় একটি কথা বারবার মনে রাখতে হবে যে, শয়তানের থাকার একমাত্র স্থানটি হলো মানুষের অন্তর। আমার, আপনার এবং সব মানুষের অন্তরেই কেবল শয়তান থাকতে পারে। অন্য কোথাও নয়। প্রতিটি বিষয় ভালো করে জানতে হলে যেমন সেই বিষয়ের কিছু মূলসূত্র থাকে এবং মূলসূত্রগুলো মেনেই অগ্রসর হতে হয়, ঠিক তেমনি শয়তান বিষয়টি ভালো করে জানবার আগে প্রথমেই মেনে নিতে হবে যে, শয়তান কেবলমাত্র মানুষ এবং জিনের অন্তরেই থাকে। অন্য কোথাও শয়তানের থাকার স্থান নাই। এই প্রধান মূলসূত্রটিকে অবহেলা করলে শয়তান বিষয়টির পরিষ্কার ধারণা হারিয়ে যেতে পারে। কারণ শয়তান মানুষের অন্তরে থেকেই মূলসূত্রটির বিষয়ে চিকন ধোঁকা দিতে পারে। যখন আমার অন্তরটিকে বাদ দিয়ে শয়তানকে অন্য কোথাও খোঁজার ধারণা জন্মাতে থাকবে তখনই বুঝতে হবে যে, শয়তান চিকন ধোঁকা দিয়ে চলছে এবং ধোঁকার ফাঁদে পা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শয়তান দুই প্রকার : রূপক শয়তান এবং আসল শয়তান। রূপক শয়তানটিকে আসল শয়তান মনে করলে বিরাট ভুল করা হবে। কারণ রূপক শয়তান না থাকলে আসল শয়তানের ধারণা করা কষ্টকর। ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে তাই আসলকে চেনার জন্য রূপকটিকে খাড়া করা হয়েছে। রূপক আসলের ধারণা দেয়। মূর্তের কাজটি হলো বিমূর্তকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। মক্কায় যে তিনটি পাথর দিয়ে বানানো শয়তান আছে উহা নিছক রূপক শয়তান : বড় শয়তান, মেজ শয়তান এবং ছোট শয়তান। প্রতিটি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারার বিধান তৈরি করা হয়েছে। রূপক শয়তানকে রূপক পাথর মারার মধ্য দিয়ে আসল শয়তানকে কেমন করে আসল পাথর মারতে হবে সেই বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেওয়া। মক্কায় অবস্থিত এই তিনটি রূপক শয়তানকে শয়তান মেনে নেওয়াটাকে বলে শরিয়ত। এই শরিয়তি তিনটি শয়তানকে অস্বীকার করলে শরিয়তের একটি অংশকে অস্বীকার করা হয়। সালেক ওলি শরিয়ত মেনে নেয়, কিন্তু যাঁরা মজ্জুব ওলি এবং কলন্দরিয়া তরিকার অনুসারী তাঁরা রূপকটিকে মেনে নেন না। কলন্দরিয়া তরিকার অনুসারীরা বলেন যে, রূপক মেনে নিলে অনেক সময় রূপকের ঠাসাঠাসিতে আসলটি যে হারিয়ে যায়। কারণ দেখা যায়, রূপকের ছড়াছড়ি-মাখামাখি এত বেশি হয় যে, আসল বলে যে কিছু একটা আছে তা আর মনে করিয়ে দিলেও মনে রাখতে চায় না। এবং তখনই ওহাবি মতবাদের জন্ম হয়। কারণ ওহাবিরা রূপক মানে, আসল মানে না। ওহাবিরা কাঠের বানানো ঠ্যাং টিকেই আসল ঠ্যাং বলে এবং কাঠের বানানো ঠ্যাংটিকেই আসল ঠ্যাং বলে প্রচার করে। অতি হালকা এবং বাহিরটিকে নিয়েই মেতে থাকে এবং রূপকের সঙ্গে যে আসলটি আছে এটা মেনে নেয় না। তাই ওহাবি মতবাদ গভীরে প্রবেশ করে না। এবং গভীরে যারা প্রবেশ করতে চায়, তাদেরকে গালিগালাজ করে। শয়তান যে কেবলমাত্র জিন আর মানুষের অন্তর ছাড়া আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও থাকে না এবং থাকতে পারে না এবং থাকার কোনো প্রকার আইন রাখা হয় নি, এই অতি সামান্য কথাটুকু অনেকেই বুঝতে পারে না। এই সামান্য প্রাথমিক মূলসূত্রটি বুঝতে না পেরে যারা ইসলামের গবেষক হয়ে যান, তাদেরকে বলার কী-বা থাকতে পারে? যে-পাথর দিয়ে মক্কার তিনটি রূপক শয়তান বানানো হয়েছে, সেই পাথর খণ্ডগুলোও তৌহিদে বাস করে এবং তসবিহ পাঠ করে। কারণ পাথর শয়তান নয়। আসল শয়তানটিকে বুঝিয়ে দেবার জন্য এবং আসল শয়তানটিকে কেমন করে চেনা যাবে, জানা যাবে, তারই জন্য এই রূপক শয়তান। রূপক শয়তানটিকে পাথর ছুঁড়ে মারার পর পায়ের জুতাস্যান্ডেল পর্যন্ত মারতে দেখা যায় এবং রূপক শয়তানটিকে পাথর মারার জন্য এমন হুড়াহুড়ি ধাক্কা শুরু হয়ে যায় যে, প্রতি বছর বেশ কিছু মানুষের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যাবার খবরটি খবরের কাগজে দুঃখভরা মন দিয়ে পড়তে হয়। অথচ মক্কায় অবস্থিত এই তিনটি শয়তান নিছক রূপক শয়তান। আসল শয়তানটি যে প্রতিটি মানুষের অন্তরে বহাল তবিয়তে বাস করছে। অন্তরের শয়তানটিকে কেমন করে তাড়াতে হবে, কেমন করে আসল পাথর ছুঁড়ে মারতে হবে, কেমন করে দুর্বল করে তুলতে হবে সেই প্রেসক্রিপশন (ব্যবস্থাপত্র)-টি যাঁরা দেবার যোগ্যতা রাখেন, তাঁরাই গুরু। তাঁরাই পীর। তাঁরাই মুরশিদ। আনুষ্ঠানিকতার ছড়াছড়ি দিয়ে নয়, লোক-দেখানো এবাদত-বন্দেগি দিয়ে নয়, বরং কামেল পীরের সন্ধান করে॥তা যত সময়ই লাগুক না কেন এবং যত কষ্টই হোক না কেন॥ সেই কামেল পীর পাবার পর সেই কামেল পীরের মুরিদ হয়ে কেমন করে সালাত, জিকির আর মোরাকাবা করতে হবে সেই বিষয়গুলো জেনে নিয়ে সাধনা করতে হবে। তা না করে কেবল অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে মারলে কোনো ফল পাবার আশা করা যায় না। ওহাবি শাস্ত্রজ্ঞরা অনেক সময় বলে থাকে যে, কোরান-হাদিসই তো যথেষ্ট, আবার পীর-ফকিরের কী প্রয়োজন? কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগবে। আমার এবং আপনার অন্তরে শয়তান আছে বলেই ভালো লাগবে। শয়তান কোনো মাধ্যম মানে না। যদিও আল্লাহ্ রাব্বুল আল আমিন মাধ্যমটিকে মেনে নিয়েছেন। আল্লাহ্‌পাক তাঁর পবিত্র কোরান প্রথমে রুহুল আমিনকে দিলেন এবং রুহুল আমিন মহানবিকে দিলেন এবং মহানবির পবিত্র ঠোঁট মোবারক হতে আমরা কোরান পাই। সুতরাং আল্লাহ্‌পাক যে মাধ্যম মানেন, ইহাই তাঁর জ্বলন্ত প্রমাণ। শয়তান আদমকে সেজদা করে না। শয়তান ওয়াহেদ আল্লাহ্ মানে, কিন্তু আহাদ আল্লাহ্‌কে মানে না, মানতে পারে না। আদমের ভেতর যে রুহটি নুরে মোহাম্মদি-রূপে বিরাজমান সেটা শয়তান মেনে নিতে পারে নি। কামেল পীরের প্রয়োজনের কথাটি ওহাবিরা অস্বীকার করে কোরান-হাদিসের দোহাই দিয়ে। অতি সাধারণ একটি প্রশ্ন করা যায় যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য বইগুলোই তো যথেষ্ট আবার শিক্ষক এবং প্রফেসরের কী প্রয়োজন? যে কোনো প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে গেলে শিক্ষকের প্রয়োজন হয়॥ তা সেই জ্ঞান বৈষয়িকই হোক, আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান হোক। শিক্ষকের উসিলা ছাড়া, শিক্ষককে মাধ্যমরূপে মেনে না নিলে, যে কোনো ধরনের জ্ঞান অর্জন করাটা প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অবশ্য যত সুন্দর করেই বোঝানো হোক না কেন, তকদিরে না থাকলে বোঝালেও বুঝতে চাইবে না। এটাসেটা বলে আমতা আমতা করে পালিয়ে যাবে। তাই এই ধরনের লোকদেরকে বোঝানো সম্ভবপর নয়। কারণ হেদায়েতের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আল আমিন। তা ছাড়া আর একটি কথা বলতে চাই যে, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি (যদিও ইমাম গাজ্জালি একশত খণ্ডে কোরান-এর বিশাল তফসিরটি রচনা করেছিলেন এবং এত বড় কোরান-এর তফসিরটি আজও কেউ করতে পারেন নি। যদিও সেই বিশাল কোরান-এর তফসিরটি সেলজুকি রাজা দ্বিতীয় মোহাম্মদ প্রকাশ্যে সবার সামনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আশা করি এই বিষয়টি সবারই কমবেশি জানা থাকার কথা), মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (ই. বি. ব্রাউন এবং রেয়ন্ড নিকলসন একবাক্যে স্বীকার করেছেন এবং জগৎকে এই বলে ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এত উঁচু মাপের মাওলানা ইসলামের ইতিহাসে আর হয় নাই, হয় না এবং ভবিষ্যতে হবেও না), হাফিজ সিরাজি, আল্লামা আবদুর

রহমান জামি, আহমদ রেফায়ি, বড়পীর সাহেব, খাজা বাবা মইনুদ্দিন চিশতি, জুনায়েদ বোগদাদি, জুননুন মিসরি, মারুফ কুকরি, মুফতি-এ আজম মাওলানা হারেভারেই, ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামির মতো অনেক পীর-মুরশিদের কি কোরান-হাদিসের জ্ঞান অনেক বেশি ছিল না? কিন্তু তাঁরা কেন পীরের হাতে মুরিদ হয়ে সালাত, জিকির এবং মোরাকাবা করতে গেলেন?

তুলি খাঁর ছেলে চেঙ্গিস খাঁর নাতি হালাকু খাঁ বাগদাদে এত ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সময় এত বড় বড় ইসলাম গবেষকরা কিছু করা তো দূরে থাক, অঘোরে প্রাণ হারাতে হলো। আর সবার চোখের আড়ালে থাকা পীর বাবা খাজা আবু ইয়াকুব এবং তাঁর প্রধান মুরিদ ও খলিফা পীর বাবা খাজা নুর মোহাম্মদ দারবন্দির কাছে সামান্য কিছু সময় অবস্থান করে নিজের ধর্মটি পর্যন্ত ত্যাগ করে কলেমা পড়ে হালাকু খাঁ মুসলমান হয়ে গেল। এটা কি সামান্য ব্যাপার বা ঘটনা বলে এক চুটকিতে উড়িয়ে দিতে চান? অন্তরে শয়তানটির অবস্থান প্রবল হলে তো তা উড়িয়ে দিতে চাইলে অবাক হবার কিছু নাই। কারণ শয়তান পীর-মুরশিদ কখনোই মানে না, বরং পীর-মুরশিদের নামটি শুনলে ঘৃণায় শয়তানের শরীর রি রি করে ওঠে। শয়তান যার অন্তরে প্রবল শক্তি ধারণ করে বসে আছে সেই মানুষটিরও পীর-মুরশিদের নাম শুনলে ঘৃণায় সমস্ত শরীর রি রি করে উঠবে এবং সেই মানুষটির পক্ষে মেনে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, সে বাহিরের শয়তানটিকে মানে এবং অন্তরে শয়তানের অবস্থানটিকে অস্বীকার করে। বাহিরের শয়তান তিনটিকে পাথর ছুঁড়ে মারতে সে বেহুঁশ, কিন্তু নিজের অন্তরের ভেতর যে শয়তানটি বসে মিটিমিটি হাসছে সেই বিষয়ে সামান্যতম হুঁশটিও নাই। তাই বলছি, যখন আচার-অনুষ্ঠান আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে তখন সেই আচার-অনুষ্ঠানগুলো কেবলমাত্র আলংকারিক হয়ে ওঠে। একটি মানুষ আল্লাহ্‌কে পাবার সাধনায় জীবন-মরণ বাজি রেখে অগ্রসর হতে থাকে এবং আল্লাহ্‌র রহমত যখন সেই সাধকের উপর বর্ষিত হতে থাকে তখন সেই সাধকের চোখ দুটো আল্লাহ্‌র চোখে পরিণত হয়, হাত দুটো আল্লাহ্‌র হাতে পরিণত হয় এবং সেই হাত দিয়ে আল্লাহ্‌ কাজ করেন, জিহ্‌বা আল্লাহ্‌র হয়ে যায় এবং সেই জিহ্‌বা দিয়ে আল্লাহ্‌ কথা বলেন॥ এভাবে সাধকের প্রতিটি অঙ্গ আল্লাহ্‌র হয়ে যায় এবং এই রকম অবস্থায় সাধক যখন উপনীত হন, তখন সেই সাধককে অনেক রকম নামে ডাকা হয়। যেমন জামাল, সারাপা, রিন্‌ধি, বান্দা নেওয়াজ, ওয়াজহুল্লাহ এবং হিন্দুরা বলেন নর নারায়ণ, নররূপী নারায়ণ ইত্যাদি। আবার পরক্ষণে একটি মানুষ যখন শয়তানের খপ্পরে পড়ে যায় এবং শয়তানকে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে থাকে তখন আস্তে আস্তে পরিপূর্ণ শয়তানে পরিণত হয়ে যায়। তখন সেই মানুষটির চোখ শয়তানের চোখে পরিণত হয়। কারণ সমস্ত হৃদয়-মন জুড়ে শয়তান বসে থাকে। শয়তান খুবই চালাক-চতুর তাই শয়তান কখনোই ঘোষণা করবে না যে, 'আনাশ শয়তান' তথা আমি শয়তান। কারণ এতে শয়তানের শয়তানি করার মওকা দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধকের হৃদয়-মন জুড়ে আল্লাহ্‌ যখন রবরূপ ধারণ করে প্রকাশিত হন, তখন সাধক 'আনাল হক' বলেন। কিন্তু শয়তান একটি মানষের হৃদয়-মন যখন সম্পূর্ণ আস্তে আস্তে খেয়ে ফেলে এবং আপন মূর্তিতে মূর্ত হয়ে ওঠে, তখন কিন্তু ভুলেও একবার 'আনাশ শয়তান' তথা আমিই শয়তান বলবে না। এটাই শয়তানের চালাকি, প্রতারণা, নীতি এবং ধর্ম। তাই সাধকেরা বলে থাকেন যে, শয়তান তার আপন রূপে একইভাবে চল্লিশ বছর অবস্থান করতে পারে, কিন্তু সাধক প্রতি বছরে নব নব রূপ ধারণ করেন। শয়তানের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে সেই মানুষটির জিহ্‌বা শয়তানে পরিণত হয় এবং সেই জিহ্‌বা দিয়ে যা কিছু বলে শয়তানই বলে। কিন্তু শয়তান এতই ভয়ংকর চালাক যে, সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক বড় বড় মাথাওয়ালাদেরকে ঘোলপানি হরদম পান করাচ্ছে। বুঝতেই পারে না যে, এই কথাগুলো সাধকের পবিত্র বাণী নয়, বরং শয়তানের পচা বচন। শুনতে কতই না মধুর লাগছে। আসলে একদম পচা বচন। বড় বড় বিদ্বানেরা বুঝতেই পারেন না যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোথাও শয়তান থাকতেই পারে না, থাকার কোনো দলিল নাই। বিদ্বানেরা বারবার একথাটি মনে রাখে সত্যি, কিন্তু আসল জায়গায় এসে মনের অজান্তে শয়তানের গোপন চালবাজিতে সব কিছু ভুলে যায় এবং শয়তানটিকে দেবতা মনে করে ফেলে। শয়তানটিকে দেবতা মনে করার কৌশলটি শয়তানের জানা আছে বলেই বারবার হোঁচট খেতে হয়। অবশ্য তকদিরের অবশ্যম্ভাবী নাচনটি জন্মের আগেই লিখা হয়ে আছে। তাই সাধকেরা বলেন, কর্ম করে যাও, কর্মফল কী হবে তা দেখতে যেয় না। তাই এই কথাটি বললে খুব একটা বেশি বলা হবে না যে, মানুষ ছাড়া শয়তান পাওয়া যায় না এবং মানুষ ছাড়া শয়তানের কোনো দলিল নাই। আবার ঠিক উল্টো করে বললেও খুব একটা বেশি বলা হবে না যে, মানুষ ছাড়া আল্লাহ্‌ পাওয়া যায় না এবং মানুষ ছাড়া আল্লাহ্‌র কোনো দলিল নাই। তাই মাওলা আলি বারবার বলেছেন, যে আল্লাহ্‌কে আলি দেখেন না সেই আল্লাহ্‌কে আলি ডাকেন না। মোজাদ্দেদে আলফেসানি বারবার তাঁর মুরিদদেরকে মোরাকাবার সাধনা করার পূর্বে বলেছেন, পীরে তাসত আউয়াল মাবুদ তাস্‌ত তথা তোমার পীরই হলো তোমার প্রথম মাবুদ। কারণ প্রথম মাবুদ এ জন্যই বলা হয়েছে, আপন পীর মাত্র তিনটি ঘরে তথা মোকামে তথা স্তরে তথা স্টেজে অবস্থান করেন। তারপর চার নম্বর মোকামে আর পীরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ চার নম্বর মোকামে যখন সাধক অবস্থান করেন, তখন দেখতে পান যে, আপন পীর বাবা ডান দিক দিয়ে চলে যান এবং শয়তান বাম দিক দিয়ে পালিয়ে যায়। কারণ লাহুত মোকামে আপন পীরও থাকে না এবং শয়তানটিও থাকে না। সাধক আপনার ভেতর চেয়ে দেখেন যে, আমার পীরও আমি এবং আমার মুরিদও আমি। এখানেই তৌহিদ-এর আগ পর্যন্ত শেরেকে অবস্থান। সুতরাং পীর ধরাও শেরেক। কারণ তখনও আমি এবং তুমি আছে। অথচ পীর ধরাটাই শেষ শেরেক। এর আগে প্রতিটি মানুষ শেরেকে ডুবে থাকে, যদিও তৌহিদে থাকার ঘোষণাটি দেয়। এই ঘোষণাটিতেও শয়তানের চালবাজি থাকে, যা বড় বড় বিদ্বানেরা মালুমই (টের) পায় না। কথার বস্তা মাথায় চেপে এই রহস্যের আগামাথা কিছুই বোঝা যাবে না। কেবলই কথার নাগর আলি, সাগর আলি হয়ে সমাজে বাহবা পাওয়া যায় এবং নিজেকে খুব বড় একটা কিছু হয়ে গেছি বলে মনে মনে আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়। তাই সাধকেরা বারবার বলেন যে, মোরাকাবার ধ্যানসাধনা ছাড়া আসল বিষয়টির কিছুই বোঝা যায় না। কারণ মোরাকাবার ধ্যানসাধনার দ্বারাই আপনার ভিতরের শয়তানটিকে তাড়াতে হয়। তাও আবার শয়তান আঠার মতো লেগে থাকে। সাধক মোরাকাবার সাধনার দ্বারা যখন মালাকুত মোকামে যায়, তখনও শয়তানটিকে আপনার মাঝে দুর্বলরূপে দেখতে পায় এবং অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর সাধক আবার মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং জাবরুত নামক মোকামে অবস্থান গ্রহণ করে অবাক হয়ে দেখতে পান যে, শয়তান আপনার মাঝে এখনও অবস্থান করছে, তবে খুবই দুর্বল, খুবই অসুস্থ অবস্থায় শয়তান অবস্থান করছে। তারপর সাধক আবার মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় কিছুদিন কাটিয়ে দেবার পর দেখতে পান যে, তিনি লাহুত

নামক মোকামে অবস্থান করছেন এবং অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখেন যে, আপনার ভেতরের শয়তানটি চিরতরে পালিয়ে গেছে। শয়তানের নামনিশানাটাও নাই। তারপর আরও বেশি অবাক হয়ে যান সাধক যখন দেখতে পান যে, আপনার পীর এতদিন একটানা যাঁর ধ্যানসাধনা করেছি, সেই পীরও আর নাই। এখন কেবলই আমি আর আমি, যেদিকে তাকাই কেবলই আমাকেই দেখতে পাই। দুই আর দেখতে পাই না। তখনই সাধক বলে ফেলেন, আনাল হক– আমিই একমাত্র সত্য; আনা সুবহানি মা আজামুশানি– আমি সুবহানি, শান কেবল আমারই; লাইসা ফী জুব্বাতে সেওয়া আল্লাতালা– এই জুব্বার ভেতর আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছু নাই; জামালে খুদ জামালে ইয়ারে দিদাম আমার পীরও আমি আবার আমার মুরিদও আমি; পীরের সুরতে নবিকে দেখলাম ওটা নবি নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ্; বাশাকলে শায়েখে দিদাম মোস্তফারা, না দিদাম মোস্তফারা বালকে খোদারা এবং অবশেষে হাজা হাবিবুল্লাহ, মাতা ফি হুব্বুল্লাহ্, শাহেনশাহে ওলি, আফতাবে ওলি, সুলতানুল হিন্দ, হিন্দাল ওলি, আতায়ে রসুল ইয়া বাবা সাইয়েদ মাওলানা মঈনুদ্দিন হাসান সাঞ্জারি আল হোসায়েনি ওয়াল হাসানির পবিত্র বাণীটি তুলে ধরলাম : ই-মানাম ইঁয়ারাম কে আন্দার নুরে হক ফানী শুদাম, মাত্লায়ে আনোয়ারে জাতে সুবহানি শুদাম তথা 'আমার ভেতর আমার বন্ধুটির নুরে হকে ফানা হয়ে গেছি, তাই যে নুরের বিকিরণ হচ্ছে সেই নুর কেবলমাত্র সোবহানির।' [ইউরোপের এক প্রখ্যাত সুফিবাদের গবেষক অকপটে তার লিখনীতে প্রকাশ করে গেছেন যে ভারতবর্ষে আজ হতে প্রায় আট শত বছর পূর্বে চার কোটি মানুষ বাস করতেন। তখন ভারতবর্ষে প্রধান চারটি ধর্মের অনুসারী ছিল। সেই চারটি ধর্মের নাম হলো জৈন ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, পার্সিধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম। খাজা বাবা প্রচার করে নব্বই লক্ষ মানুষকে মুসলমান বানিয়েছিলেন। যদি খাজা বাবা বলতেন, আমিই সব, আমাকে অনুকরণ-অনুসরণ করবে, তা হলে আজ ভারতবর্ষের মুসলমানেরা খাজা বাবার নামটি ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করে নিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অথচ অবাক হবার কথা হলো যে, তিনি নব্বই লক্ষ নব্য মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে বলে দিলেন যে, আমি কেবলমাত্র মহানবির একজন নগণ্য গোলাম। ফারসি ভাষায় হুবহু তুলে ধরলাম : বারদ্বার গাহিশ গাদায়েম সুলতানে মা মোহাম্মদ । ইসলামের ইতিহাসে এত বিধর্মীকে মুসলমান বানাবার দৃষ্টান্তটি আর নাই। ইহা যদিও অপ্রিয়, কিন্তু সত্য কথা। ওহাবিদের চাপে এবং ব্যাপক প্রচারে খাজা বাবার মূল্যায়ন দিনে দিনে কিছুটা ম্লান হয়েছে বৈকি! কারণ সুফিবাদের ভাণ্ডারটি যে ফারসি ভাষায় রচিত সেই ফারসি ভাষাটিকে মুসলিম দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে। আজ দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে চাই যে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের কৃতজ্ঞতা খাজা বাবার উপর কতটুকু তা প্রত্যেকের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন।] এখানেই সাধক নিজেকে চিনতে পারেন, রবকে চেনা হয়ে গেছে বলেন (অতীতকাল)। এখানেই বান্দাও নাই, আঁকাও নাই। এখানেই গোলামও নাই, মাওলাও নাই। এখানেই নিজের সেজদা নিজেই করেন। এখানেই সাধক বান্দা নেওয়াজ। এখানেই সাধক আরিফ বিল্লাহ। এখানেই প্রতিটি সাধক গাউসুল আজম। (অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাবে এই গাউসুল আজমের রহস্যটি বুঝতে পারেন না)। এখানেই সাধক মাওলাউল আলা। এখানেই সাধকের চরম ও পরম পাওয়া। এখানেই সাধকের আপন রব বিশ্বরবের সুরতে ধরা দেয়। এখানেই 'নাই কোনো ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্ ব্যতীত প্রশংসিত আল্লাহ্র রসুল ছাড়া' কথাটির রহস্য পরিপূর্ণরূপে ধরা পড়ে। এখানেই সাধক দেখতে পান, 'সব প্রদীপে একই আলো।' এখানেই সাধক দেখতে পান, বহু প্রদীপের আলো জ্বলছে, কিন্তু এই বহু আলো একই আলো।

আপন প্রবৃত্তির বৃত্তে শয়তানের একমাত্র থাকার স্থান। এই বিষয়টিকে বাদ দিয়ে এবং এই বিষয়টির প্রাধান্য না দিয়ে ধর্মীয় গবেষণা কেমন করে চলতে পারে তা মোটেও বুঝতে পারি না। শয়তান যেমন খান্নাসরূপ ধারণ করে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অবস্থান করছে, ঠিক আবার আল্লাহ্ও রুহরূপে প্রতিটি মানুষের মাঝে আছেন। সুতরাং সত্য কথাটি বলতে কি, একটি মানুষের মাঝে রুহ, নফ্স এবং খান্নাসরূপী শয়তান॥মোট তিনজন বাস করে। রুহকে মোরাকাবার দায়েমি সালাতের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে হয়। কেননা মহানবি বারবার বলেছেন, সালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম মিনাস্ সালাতিল ওয়াক্তি অর্থাৎ সার্বক্ষণিক নামাজ ওয়াক্তিয়া নামাজের চেয়ে উত্তম। কিন্তু শয়তানকে জাগিয়ে তুলতে হয় না, কারণ শয়তান সব সময় ধোঁকা দেবার জন্য জেগেই থাকে। অনেকটা জমিনে ধান-গম রোপণ করার পর দেখা যায় আগাছাগুলো আপনি গজিয়ে উঠেছে। কারণ কৃষক আগাছা রোপণ করেন না, আগাছা আপনিই গজায়। ঠিক সে রকম, আগাছার মতো, শয়তানকে জাগাতে হয় না। মক্কায় তিনটি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারতে হয়, কিন্তু ইহা মোটেই শয়তান নয়, বরং একদম রূপক শয়তান। প্রতীকী শয়তান। প্রতীকী রূপক শয়তানটিকে আসল শয়তান মনে করলে বিরাট ভুল করা হবে। কারণ এই রূপক শয়তানটিকে এ জন্যই রাখা হয়েছে যেন আসল ও প্রকৃত শয়তানটির ধারণা জন্মাতে পারে। কারণ আসল শয়তান মানব অন্তরে থাকে, মক্কায় থাকে না। মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কাবাঘরটি অবশ্যই আল্লাহ্র ঘর। কিন্তু প্রতিটি মানুষের দিল-কাবাঘরটিও আছে এবং মোমিনের দিলই হলো জ্যান্ত কাবাঘর। (এই বিষয়টি কোরান-হাদিসের দলিল দিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ কেবলা ও নামাজ বইটি রচনা করেছেন বাংলার বিখ্যাত ইসলাম গবেষক শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি। তাই পাঠকদের অনুরোধ করছি বইটি পড়তে)। কারণ মোরাকাবার সাধনায় দায়েমি সালাতে ডুবে থেকে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে দিলটিকে জ্যান্ত কাবায় পরিণত করা যায়। যিনি তার দিল-কাবাকে জ্যান্ত কাবাতে পরিণত করতে পেরেছেন তার কাছে মুরিদ হয়ে কেমন করে আপন দিল-কাবাকে জ্যান্ত কাবায় পরিণত করা যায় সেই চেষ্টা করে যেতে হবে। মোমিনের জ্যান্ত দিল-কাবার জ্যান্ত তোয়াফ কেমন করে করতে হবে সেটা মোমিনই শিখিয়ে দেবেন। (একটি সত্য কথা বলতে চাই। বলতে চাই, কিছুটা ঢাকনা দিয়ে, কিছুটা গোপন করে, কিছুটা ইঙ্গিত-ইশারায় যে, আগের দিনের ওলি-আল্লাহ্দের নামের আগে আলহাজ শব্দটি থাকত না। যেমন আলহাজ বু আলি শাহ কলন্দর, আলহাজ নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, আলহাজ হজরত আমির খসরু, আলহাজ বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর, আলহাজ বাবা আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি। জ্ঞানীজন আমার এই ইঙ্গিত-ইশারাটি সহজেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু মডার্ন যুগের হাওয়া-বাতাসে মডার্ন যুগের আউলিয়াদের নামের আগে আলহাজ শব্দটি দেখতে পাই। অধম লেখকের পীর ও মুরশিদ কেবলায়ে কাবা মাওলানা শাহ জালাল নূরী অফি আনহুও মক্কায় গিয়ে পবিত্র হজ কার্যটি পালন করেছেন এবং তিনিও নামের আগে আলহাজ শব্দটি ব্যবহার করতেন এবং আমি অধম লিখক পীর বাবার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতাম। পীর বাবাকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারতাম এবং হয়তো তিনি উত্তরটি নাও দিতে পারতেন। কিন্তু প্রশ্ন করি নাই। কারণ 'সেজদা ভি কারে শেকোয়া ভি কারে বান্দে কা ইয়ে দাস্তুর

নাহি হ্যায়' অর্থাৎ 'আপনাকে সেজদাও করব আবার প্রশ্নও করব এটা মুরিদের লক্ষণ নয়'। অথচ অধম লেখকের দাদা পীর শাহ সুফি গাউসুল আজম মাওলানা নূরী চান শাহ এই সেদিন পর্দা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর নামের আগে আলহাজ শব্দটি নাই। অধম লেখকের বড় বাবা মাওলাউল আলা গাউসুল আজম, বাংলার মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি বলে যিনি সুপরিচিত (দৈনিক যুগান্তর), বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর নামের আগেও আলহাজ শব্দটি নাই এবং বাবা সুরেশ্বরীর পীর রসুলে নোমা, রুতবায়ে আলা, বান্দা নেওয়াজ বাবা শাহ সুফি ফতেহ আলি শাহের নামের আগেও আলহাজ শব্দটি নাই)।

আদম ও মানুষের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা

একেক মোমিনের নিয়ম-কানুন একেক রকম হতে পারে, কিন্তু পরমে গমন করার প্রশ্নে সবাই একমত। সুতরাং ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের একটি বাহিরের দিক আছে এবং অপরটি ভেতরের দিক আছে। (মানবদেহেও আমরা দেখতে পাই, কিছুটা বাহিরের দিক আছে আবার কিছুটা ভেতরের দিক আছে। মানবদেহের ভেতরের দিকটি দেখতে হলে এক্সরে, এন্ডোসকপি, আলট্রাসনোগ্রাম, সিটি স্ক্যানিং ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে দেখতে হবে)।
শয়তান বাহির নিয়ে থাকার পরামর্শ দেবে এবং ভেতর বলে কিছু নাই বলে, একদম ফাক্কা বলে অনেক প্রকার ধারালো যুক্তি প্রদর্শন করাবে।
মোমিনের জীবন্ত দিল-কাবাটি গোপন রহস্যে ভরপুর। এই ভেদরহস্য আদমের মাঝে ছিল বলেই আল্লাহ্ আজাজিলকে আনুগত্যের সেজদা দিতে বলেছিলেন। কিন্তু আজাজিল কিছুতেই ধারণা করতে পারে নি এবং গোপন ভেদ রহস্য বুঝতে পারে নি এবং আদমের ভেতর আল্লাহ্ স্বয়ং কেমন করে নুরে মোহাম্মদি রূপে বিরাজ করছেন এটা বুঝে উঠতে পারে নি। আদম সুরতের ভেতর আল্লাহ্ আহাদ-রূপে বিরাজ করছেন এই রহস্যটুকু আজাজিলের জানা ছিল না। আজাজিল আল্লাহ্কে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমানরূপে ধারণা করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ যে সর্ববিষয়ে শক্তিমান তথা সর্বশক্তিমান এই ধারণাটুকু করতে পারে নি। তাই আহাদ-আল্লাহ্র আনুগত্যের সেজদাটি দিতে অস্বীকার করেছিল। আরও অবাক হবার কথাটি হলো যে, আজাজিল ওয়াহেদ-আল্লাহ্র আনুগত্যের সেজদাটিকে অস্বীকার করে না। তাই আল্লাহ্ বলেছেন, আদমকে আল্লাহ্র সুরতে বানানো হয়েছে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো আর সেই বিষয়টির আলোচনা করতে গিয়ে প্রায়ই ভুল করি। আর সেটা হলো, প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্র সুরতে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্র সুরতে বানানো হয় নি। কারণ তা হলে আল্লাহ্কে বলতে হতো, খালাকাল্লাহু ইনসানা আলা সুরাতিহী। কিন্তু আল্লাহ্ ইনসান শব্দটি ব্যবহার না করে আদম শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইনসান আর আদমের মাঝে পার্থক্য আছে। ইনসান নবি নয়, কিন্তু আদম নবি। ইনসান শফিউল্লাহ্ নয়, কিন্তু আদম শফিউল্লাহ্। ইনসান রসুল নয়, কিন্তু আদম রসুল। ইনসানের ভিতর নুরে মোহাম্মদি আছে। জাগ্রত নয়, বরং ঘুমন্ত। কিন্তু আদম জাগ্রত নুরে মোহাম্মদিতে নুরময়। তাই আদম একদিকে ইনসান হয়েও পরিপূর্ণরূপে ইনসানে কামেল, পরিপূর্ণ মোমিন এবং জীবন্ত কাবা। তাই আদম ইনসানের জন্য জীবন্ত কেবলা। তাই আদমের চেহারা আল্লাহ্র চেহারা। তাই আদম আল্লাহ্র রহস্য এবং আল্লাহ্ আদমের রহস্য। আদম শফিউল্লাহ্, আদম নবি। আদম রসুল। আদম নুরে মোহাম্মদিতে নুরময়। আদম ইনসানে কামেল। আদম মোমিনের প্রতিমূর্তি। আদম আরিফবিল্লাহ। আদম আবদুহু। আদম মাওলাউল আলা। আদম মাহবুবে সোবহানি। আদম কুতুবে রাব্বানি। আদম গাউসে সামদানি। আদম আফতাবে ওলি। আদম ওয়াজহুল্লাহ্। আদম জামাল। আদম শারাপা। আদামের আদা (রূপবৈচিত্র্য) রহস্যপূর্ণ। তাই সবাই বুঝতে পারে না। আদম গাউসুল আজম। আদম সোবহানি। আদম রাব্বানি। আদম মাওলা। আদম সুলতানুদ্ দুনিয়া। তাই তিনি কলুষিত বস্তুবাদীর দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন। কলুষিত বস্তুবাদীর দৃষ্টির দর্শনে আদম বারবার অপমানিত হবেন। বস্তুবাদীর দর্শনের পাল্লায় আদমকে মাপা যায় না। বস্তুবাদী দর্শন অজানা-অদেখা-অচেনায় ডুবে থাকতে ভালোবাসে। কচুরিপানার মতো ভাসমান যুক্তিতর্ক দিয়ে আদমকে বুঝতে চেয়ে ব্যর্থ হয়। আদমপ্রেমে ডুব দিয়ে মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় আদমকে চিনতে হয়। অন্যথায় অসম্ভব। আদমের রহস্য জানতে পারলে আল্লাহ্কে জানা যায়। আদমপ্রেমে ডুব দিলে চোখ দুটো আকাশের দিকে খোলা না রেখে আপন কলবের দিকে চোখ দুটো বন্ধ করে ধ্যানে ডুবে থাকতে হয়। কারণ কলবের জ্ঞান লাভ করতে হলে চোখ দুটো কলবের দিকে থাকবে। কারণ কলবের জ্ঞান আর মাথার জ্ঞান এক বিষয় নয়। কারণ কলবের জ্ঞান বুকে চাপ দিয়ে দেওয়া হয়। কলবের জ্ঞান দানের বিষয়, কিন্তু অর্জনের বিষয় নয়। তবে দানের বিষয় হলেও মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি অবশ্যই করতে হবে। মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি বাদ দিয়ে কেবল দানের বিষয় ভেবে বসে থাকলে কিছুই পাওয়া যাবে না। কপালে কেবল যুক্তির কাঁচকলাটাই ঝুলবে। আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো যে, অনেকেরই ধারণা যে মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় বিরাট ধনী হতে পারবে কি-না, বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক হতে পারবে কি-না ইত্যাদি। মহানবি মা খাদিজাকে বিয়ে করার পর, মা খাজিদা তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ মহানবিকে দান করে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা একমত যে, সেই দিনে জাজিরাতুল আরবে সবচেয়ে বড় ধনী ছিলেন মা খাদিজা। এমন কথা শোনা যায় যে, মা খাদিজার যত উট ছিল তা একটার পেছনে আর একটা দাঁড় করিয়ে দিলে প্রায় তিন মাইল লম্বা হতো। এখন বিরাট একটি প্রশ্ন হলো, মহানবিকে এই বিশাল সম্পত্তি দান করার পর সেই সম্পত্তি আর মহানবির কাছে দেখতে পাই না কেন? কোথায় চলে গেল এত প্রচুর ধন-সম্পদ? কোথায় চলে গেল তিন মাইল লম্বা উটের কাফেলা? এ জন্যই খাজা গরিবে নেওয়াজ বলেছেন যে, তুমি দুনিয়াটাও ষোলআনা চাইবে, আবার আল্লাহ্কেও চাইবে, এটা আজব কথা, মনগড়া কথা। মনে মনে হাজারও আনন্দ পেতে পারো, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তো পাবার কথা নয়। (দিওয়ানে খাজা)। রূপক শয়তান যেমন আসল শয়তান নয়, বরং আসল শয়তানটিকে চিনিয়ে দেবার একটি অপূর্ব সুন্দর মহড়া (ট্রেনিং), তেমনি তিনটি রূপক শয়তানকে যে পাথর ছুঁড়ে মারতে হয় উহা নিছক রূপক পাথর। আসল পাথর নয়। আসল পাথরটিকে চিনিয়ে দেবার একটি অপূর্ব সুন্দর মহড়া (ট্রেনিং)। যে পাথর-দিয়ে-বানানো কাবাটিকে তোয়াফ করা হয় সেই কাবা ও তোয়াফ দিয়ে মোমিন নামক জীবন্ত কাবাটিকে তোয়াফ কেমন করে করতে হবে সেটা চিনিয়ে

দেবার অপূর্ব সুন্দর নিদর্শন। পবিত্র মিনাতে যে পশুটি কোরবানি করতে হয় সেই পশু কোরবানিটি দিয়ে মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা আসল পশুটিকে কেমন করে কোরবানি করতে হবে তারই একটি অপূর্ব সুন্দর মহড়া। আকার রূপটি দিয়ে নিরাকারের ধারণা জন্মায়। পশুর গোশ্ত আল্লাহ্পাকের দরবারে গৃহীত হয় না, বরং গৃহীত হয় আপনার ভেতরে বাস করা পশুটি কোরবানি করার মহান তাকওয়াটি। কারণ আল্লাহ্ যেমন ধৈর্যশীল তথা সবরকারীর সঙ্গে থাকেন, তেমনি তাকওয়াকারীর সঙ্গে থাকেন। কেউ ধরতে পারেন, কেউ পারেন না। কারণ ধরার বিষয়টি তকদির দ্বারা নির্ধারিত। যেমন বনের হাতি মাংস খাবে না, খাবে সবজি এবং বনের বাঘ সবজি খাবে না, খাবে মাংস। কারণ এটাই হাতি আর বাঘের জন্মের আগেই নির্ধারণ করে দেওয়া শক্ত তকদির। এই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমাকে খুব সাবধানে কলম চালাতে হয়েছে। কারণ বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। রূপক নামক শব্দটি সব বিষয়ে খাটলেও লিখতে পারলাম না। ইহা আমার কৃপণতাও নয়, উদারতাও নয়। কারণ যারা জ্ঞানী, যারা বোঝে, তাদের ইংগিত-ইশারা দিলেই বুঝতে পারে। আর যারা সহজে বুঝতে পারে না তাদেরকে আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিতে হয়। মারেফতের অনেক অনেক গোপন বিষয় সাহাবাদের জানা থাকা সত্ত্বেও যুগের পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারেন নি, তবে অতি গোপনে একান্তজনের কাছেই বলতে পেরেছেন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত বোখারি শরিফ-এর পঁচানব্বই নম্বর হাদিসটি এবং হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসটি পড়লেই বোঝা যায়। তবে এই অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বাস করে সব কিছুরই বিশ্লেষণ করতে হয়। ছবি তোলা হারাম কথাটি এখন অনেকটা অচল। কারণ বিদেশ ভ্রমণে পাসপোর্টের ছবিটি যে তুলতেই হবে। এখন তো খোদ আরব দেশের টাকার মধ্যে রাজা-বাদশাহ্দের ছবি দেওয়া হয়। ছবির জন্য যদি ফেরেশতার আগমন না হয়, তো সমগ্র আরব দেশের মুসলমান ভাইদের পকেটে ছবিওয়ালা টাকা যে অবশ্যই রাখতে হয়। এসব কথা ধরতে নাই। চুপ করে থাকাটাই ভালো। তবে কিছু কিছু বিষয়ে প্রতিবাদ অনেকটা বাধ্য হয়েই করতে হয়। তাই তো জ্ঞানের সাগর বাহারুল উলুম হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি বারবার এই কথাটি বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, মাসলা-মাসায়েল, হাদিস-ফেকাহ্, এজমা-কিয়াস আর কোরান তফসির জানা এক কথা, আর নিজেকে চেনা ও জানার আধ্যাত্মিক বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা কথা। উনার পীর সাহেব হজরত আবু আলি ফারমাদি একজন নিরক্ষর ছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, নিরক্ষরের কাছে কোন জ্ঞানের খনি লুকিয়ে আছে যে ইমাম গাজ্জালির মতো মহাজ্ঞানীকেও মুরিদ হতে হলো? এ রকমভাবে বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। শুনেছি হালাকু খাঁর পীর সাহেব হজরত খাজা নুর মোহাম্মদ দারবন্দিও নিরক্ষর ছিলেন। এই নিরক্ষর পীর খাজা নুর মোহাম্মদ দারবন্দি হালাকু খাঁ-কে মুসলমান বানাতে পেরেছিলেন। বাগদাদের বড় বড় ঢাউস আলেম, উলামা, মোফাচ্ছের ও শায়খুল হাদিসেরা মুসলমান বানানো তো দূরের কথা, বরং হালাকু খাঁর বর্বর হিংস্র সৈনিকদের হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন।

আমার একটি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কথাটি বলতে চাই। নারায়ণগঞ্জের কোনো এক মসজিদের ইমাম সাহেব বেলতলির বাবা সোলায়মান শাহ লেংটাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতেন। একদা পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে জুমার নামাজ আদায় করতে হয়েছিল সেই মসজিদে। এত জঘন্য অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারেন একজন ইমাম সাহেব, তা আমার জানা ছিল না। যেহেতু বাবা সোলায়মান লেংটা থাকতেন, তাই তাঁর লজ্জাস্থানটির বিশদ অশ্লীল বর্ণনাটি বাধ্য হয়ে শুনতে হলো এবং অবশেষে শেষ কথাটি হলো, যারা বেলতলির লেংটার ওরসে যায়, তারা জাহান্নামের ঠিকানা করে নেয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। নিয়তির কী অপূর্ব লিখন, অনেক দিন পর, প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর পর, রোগী দেখার জন্য নারায়ণগঞ্জ যেতে হলো। রোগী দেখার পর অনুরোধ করা হলো একজন হাক্কানি (?) আলেমের চিকিৎসার জন্য। গেলাম এবং রোগীকে দেখে চমকে উঠলাম। কাগজপত্র দেখে দেখতে পেলাম, রোগটির নাম 'মেটাস্টাইটিস কারসিনোমা' তথা ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সার। তাও আবার লজ্জাস্থানে হয়েছে। কী ভীষণ, কী করুণ অবস্থা যা দেখার মতো নয়। পরে অপারগতার কথাটি জানিয়ে বিদায় নিলাম আর অনেক কিছু ভাবলাম। তথাকথিত ডিগ্রিধারী এলিট সমাজের জার্সিপরা বিদ্বানেরা হয়তো অন্য কারণে ক্যান্সার হয়েছে বলে বয়ান দেবেন। কারণ তারা পীর-ফকির মানেন না। যেমন মহাবিদ্বান শয়তান আদমকে মানে না। বাবা সোলায়মান ঝাড়ফুঁক আর তাবিজ-তুম্বাওয়ালা খনকার নামক পীর নন যে, যা মুখে আসে তাই বলে দেবেন। মোল্লা মোল্লাই। তাই মোল্লা দিয়ে মহানবিকে বিচার করা ঠিক নয়। গির্জার যাজক দিয়ে যিশুখ্রিস্টকে বিচার করা ঠিক নয়। খাদেম দিয়ে খাজা বাবাকে বিচার করা ঠিক নয়। কাষ্ঠ পুরোহিত দিয়ে কৃষ্ণকে বিচার করা ঠিক নয়। মাতাল দিয়ে মহাদেবকে বিচার করা ঠিক নয়। যদিও মহাদেব ভাং নামক নেশা সেবন করতেন। মহাদেবের একটি মূল্যবান বাণী তুলে ধরলাম। তিনি বলেছেন, যে ধর্মের মাঝে অধ্যাত্মবাদ নাই, সেটা কোনো ধর্মই নয় (সির্‌রে হক জামে নূর)। এটা একটি বাস্তব সত্য যে, আজ বাবা সোলায়মান শাহ লেংটার উরসে বেলতলিতে কম করে হলেও দশ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়। আর সেই ভেংচিকাটা অশ্লীল বাক্য নিক্ষেপকারী মোল্লার কবর ও পরিচয় কেউ জানেও না। আর কোনোদিন জানবেও না। কালের অমোঘ সত্যের বিচারে একজন চিরতরে হারিয়ে যায়, আর অপরজন অমর হয়ে থাকেন।

সুফিবাদের দৃষ্টিতে আমি ও আমার বলার রহস্য

আমি আর আমিত্ব এক বিষয় নয়। যে আমি ও আমার বলে তার মধ্যে আমিত্বের ত্ব-টি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এটা বোঝা কষ্টকর। কারণ কোন আমির মধ্যে ত্ব-টি আছে আর কোন আমির মধ্যে ত্ব-টি নাই ইহা সহজে বোঝা যায় না। ত্ব-এর মধ্যে খান্নাস আছে কি নাই এটা সেই বুঝতে পারবে যার মধ্যে খান্নাস নাই। মাওলানা রুমি তাই একটি সুন্দর চমৎকার এবং সূক্ষ্ম শিক্ষণীয় কথা বলেছেন এই বলে যে, মনসুর হাল্লাজ আমিই একমাত্র সত্য বলেছেন আবার ফেরাউনও 'আমিই খোদা' বলেছে। মনসুরের দাবি আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণীয় হলো, আর ফেরাউনের দাবি বর্জনীয় হলো। কারণ ফেরাউনের দাবির মাঝে যে 'আমিটি' আছে উহাতে ত্ব-টি আছে তথা খান্নাস আছে তথা খান্নাসটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি বলেছে, অথচ মনসুর হাল্লাজের আমিটির মাঝে ত্ব নাই তথা খান্নাস নাই তথা খান্নাসটিকে বাদ দিয়ে বলেছেন। অথচ দুইজনই মানুষ, দুইজনেই মানবশরীর নিয়ে তৈরি।

দেখতে দুই জনই মানুষ। কিন্তু জটিল বিষয়টি হলো যে, কে ত্ব-টিকে বাদ দিয়ে আমি বলছে আর কে ত্ব-টিকে সাথে রেখে আমি বলছে এই বিষয়টি সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা এমনকি ঝানু ইসলাম গবেষকও তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। তাই কিছু গবেষকেরা বলে থাকেন যে, আমি ও আমার বলাটাই দোষণীয়। আমার অন্যান্য বইতে এ রকম কথাটি পাবেন, তবে ব্যাখ্যা দেই নি। পরে যখন বুঝতে পারলাম যে, এই কথাটির কিছুটা ব্যাখ্যা না দিলে হয়তো অনেকে ভুল বুঝতে পারেন অথবা ভুল করতে পারেন। আমি ও আমার বলার মাঝে অহংকার থাকে তখনই যখন খান্নাসটি সঙ্গে নিয়ে বলা হয়। আবার আমি ও আমার বলার মাঝে অহংকারটি থাকে না তখনই, যখন খান্নাসটিকে সঙ্গে না রেখে বলা হয়। এখন প্রশ্নটি হলো, কে খান্নাসটিকে বাদ দিয়ে আমি ও আমার বলছে এই বিষয়টি বোঝা খুবই কষ্টকর। তাই মহান ওলিদের দরবারে গিয়ে কিছু শুনে তবে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সুতরাং আমি ও আমার বলার মাঝে পাইকারিভাবে শয়তানের কথা বলাটা মোটেই সঠিক নয়। কারণ কোনো ওলি (যাকে ওলি বলে চেনা যায় না অথচ ওলি) যদি আমি ও আমার বলেন তো উহা কখনোই শয়তানের কথা হতেই পারে না। কারণ ইহা খান্নাস-বর্জিত কথা। হজরত মনসুর হাল্লাজের পীর ও মুরশিদ হজরত জুনায়েদ বোগদাদি বলেছেন যে, আল্লাহকে আমার সঙ্গে রেখে অহংকার করা যায়, নতুবা অহংকারই করা যায় না। তিনি (জুনায়েদ) অনেক সময় মাস্তির হালে মুরিদদের সামনে বলে ফেলতেন, লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্তালা তথা 'এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নাই।' সুতরাং এই কথাগুলো সম্পূর্ণরূপে খান্নাস-বর্জিত কথা। সুফি কবি আল্লামা ইকবাল যে খুদিকে শক্তিশালী করতে বারবার উপদেশের ভাষায় বলেছেন, সেই খুদিটি সম্পূর্ণ খান্নাস-বর্জিত খুদি। খান্নাস-বর্জিত খুদিকে ফেরেস্তারা সব সময় পাহারা দিয়ে রাখে এবং সেই খুদির নিকট শেখার মতো অনেক কিছু আছে। সুতরাং খান্নাস-বর্জিত খুদিটি তথা আমিটি পবিত্র এবং এই কথাটি কোরান-এর সূরা মুমিনুনের ষাট নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে : ফা কালা রাব্বুকুম উদ্উনি আস্তাজেব লাকুম–সুতরাং তোমাদের রব বলিলেন, 'ডাকো (একা) অবশ্যই জবাব পাবে।'

'উদ্উন'-এর মাসদার হলো দাউন তথা ডাকা। এখানে 'উদ্উনি' তথা একা ডাকা তথা খান্নাস-বর্জিত ডাকা। আর যদি খান্নাসকে সাথে নিয়ে ডাকা হয় তো দুইজন হয়ে যাবে : আমি এবং খান্নাস। সুতরাং 'উদ্উনা' তথা দুইজন (আমি ও খান্নাস) হলে ডাকের জবাব পাওয়া যাবে না। 'আস্তাজেব'-এর মাসদার হলো আল এজাবা আর আল এজাবার অর্থটি হলো সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাওয়া। সুতরাং কোরান 'উদ্উনি' (একা) বলেছে, 'উদ্উনা' (আমি ও খান্নাস) বলে নি। খান্নাস- বর্জিত আমিটি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে (লাকুম) জবাব দেওয়া হবে।

সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিবে নেওয়াজ মুরিদদের বলতেন, আমি ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাই, কিন্তু তোমরা পাও না। মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় লিপ্ত থাকো, দেখতে পাবে একদিন ডাকের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাচ্ছ। ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি বলেছেন, আনা সুবহানি মা আজামুশ শানি তথা 'আমিই সুবহানি এবং সমস্ত শান আমারই।' হজরত বায়েজিদের এই কথার মধ্যে 'ত্ব' নাই তথা খান্নাস নাই। সুতরাং এই আমি ও আমার বলার মাঝে সংশয় থাকার কিছু নাই।

অবশেষে বাংলার বিখ্যাত ওলিয়ে কামেল, নলতা শরিফে যাঁর সৌন্দর্যের প্রশ্নে অদ্বিতীয় মাজার, সেই শাহ সুফি খান বাহাদুর আহ্সানউল্লাহ্র দাদা পীর হজরত ওয়ারেস করমের অন্যতম প্রধান খলিফা হজরত বেদম তাঁর কালামে লিখে গেছেন, খুদ কাশীসে কম নাহি হায় নূরে ইশ্ক মে আঁহ্ কো জবত্ কারনা তথা 'আত্মহত্যার চেয়ে কোনো অংশেই কম নহে প্রেমের নুরে ডুবে যাবার সময় আনন্দের চিৎকারটিকে দমন করে রাখা।'

কোরান-এর কিছু আয়াতের অংশবিশেষ যাহা প্রচলিত অনুবাদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম

পবিত্র কোরান মজিদ-এর ১৭ নং সূরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, সুব্হানাল্লাজি আস্রা বে-আবদেহি লাইলান। 'ভাসমান ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন রাত্রির মধ্যে।'

এই আয়াতের আবদেহি শব্দটির টীকায় বলা হয়েছে, কালা বে-আবদেহি দূনা নাবীয়্যেহি লাইলান ইয়াতাওয়াহামু ফিহে নাবুওয়াতান ওয়া বেলায়েতেহি। কালাল্ ইমামু ফি তাফসিরেহি আন্নাল অবুদিয়াতা আফজালুন মিনার রেসালাতে।

বলা হলো, বে-আবদেহি। নবি ব্যতীত। (অথচ এই আয়াতে নবি বলা হয় নি)। ঐ রাত্রিতে যাহাতে আমরা বুঝতে পারি তার মধ্যে নবুয়ত এবং রেসালতকে বলা হয় নি।

ইমাম সয়ুতি তাঁর তফসিরের মধ্যে বলছেন, নিশ্চয়ই উবুদিয়াত (দাসত্ব) রেসালত হইতে উত্তম। (তফসিরে জালালাইন ২২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

এখানে বাক্যে আবদেহি বলা হলো অথচ নবি বলা হয় নি। নবুয়ত এবং বেলায়েত এবং রেসালত কখনোই আবদিয়াতের (দাসত্বের) সমতুল্য নহে। তাই নবুয়ত, বেলায়েত এবং রেসালত শব্দগুলোর কোনো একটিকেও এই আয়াতে না এনে আবদিয়াতের (দাসত্বের) মর্যাদাকে সমুন্নত করা হয়েছে। মেরাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন ঘটনাতে আবদিয়াত শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ্ রাব্বুল আল আমিন নবুয়ত, বেলায়েত এবং রেসালতের শব্দগত অবস্থানকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

কেননা, আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আল আমিন সুবহানাল্লাজি আসরা বে-নাবিয়েহি অথবা বে-বেলায়েতেহি অথবা বে-রেসালাতেহি না বলে, বরং বে-আবদেহি শব্দটি নির্বাচন করে প্রয়োগ করেছেন। ইহাতেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নবুয়ত, রেসালত এবং বেলায়েত লাভ করা যতটুকু না কষ্টকর তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি কষ্টকর হলো নিজেকে আবদিয়াতের (দাসত্বের) পথে এগিয়ে নেওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা। (ইহা অপ্রিয় সত্য

হলেও বলতে হয় যে, কোরানুল হাকিম-এর এই চারটি শব্দের প্রতিটির ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তির শব্দের গুণে গুণান্বিত হওয়া একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ রহমত ব্যতীত অসম্ভব)।

সূরা বনি ইসরাইলের ৭৮ নং আয়াত : আকিমিস সালাতা লেদুলুকিশ্ শামসে ইলা গাসাকিল লাইলে ওয়া কোরানাল্ ফাজরে, ইন্না কোরানাল্ ফাজরে কানা মাশহুদান।

সালাত কায়েম করো (আকিমুস সালাতা) সূর্য ঢলে যাবার কারণে (লেদুলুকিশ্ শামসে) রাত্রির অন্ধকারের দিকে (ইলা গাসাকিল লাইলে) এবং ভোরের কোরান (কোরআনাল্ ফাজরে)। নিশ্চয়ই ভোরের কোরান হয়, প্রমাণিত। (ইন্না কোরআনাল্ ফাজরে কানা মাশ্হুদান)।

সূরা মোদ্দাছেরের ৩১ নং আয়াত : ওয়া মা জাআল্না আস্হাবান নারে ইল্লা মালাইকাতান।

এবং আমরা নির্বাচন করি না (ওয়া মা জাআলনা) আগুনের অধিবাসী (আস্হাবান নারে) ফেরেশতা ব্যতীত (ইল্লা মালাইকাতান্)।

সূরা বাকারার ১৯ নং আয়াত : আও কাসাইয়েবিন মিনাস্ সামায়ে ফিহে জুলুমাতুন ওয়া রাআদুন, ওয়া বারকুন, ইয়াজআলুনা আসাবেআহুম ফি আজানেহিম মিনাস সাওয়ায়েকে হাদারাল মাউতে, ওয়াল্লাহু মুহিতুন বিল কাফেরিনা।

অথবা (আও) উহা প্রবল বৃষ্টিপাতের মতো, (কাসাইয়েবিন) যাহা বর্ষণ হয় আকাশ হইতে (মিনাস্ সামায়ে) উহার মধ্যে রহিয়াছে অন্ধকার (ফিহে জুলুমাতুন) এবং বজ্র (রাআদুন) এবং বিদ্যুৎ (বারকুন)। (তাহাতে তাহারা) নির্বাচন করে (ইয়াজআলুনা) তাহাদের অঙ্গুলিসমূহ (আসায়াবেহুম) তাহাদের কর্ণসমূহের মধ্যে (ফি আজানেহিম) বজ্রধ্বনি হইতে (মিনাস্ সাওয়ায়েকে) যখন উপস্থিত হয় তাহাদের মৃত্যু (হাদারাল মাউতে) এবং আল্লাহ (ওয়াল্লাহু) পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন (মুহিতুন) কাফেরদের দ্বারা (বিল কাফেরিনা)।

সূরা হিজরের ৯ নং আয়াত : ইন্না নাহ্নু নাজ্জাল্নাজ জিক্রা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফেজুনা।

নিশ্চয়ই আমরা (ইন্না নাহ্নু) নাজেল করি (অবতীর্ণ) জেকের (নাজ্জাল্নাজ্ জিক্রা) এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার জন্য (ওয়া ইন্নালাহু) অবশ্যই হেফাজতকারী (সংরক্ষণকারী) (লা হাফেজুনা)।

কোরান-এর ১৯ নং সূরা মরিয়ম-এর ১৭ নং আয়াতের অনুবাদ ও সামান্য ব্যাখ্যা :

ফাত্তাখাজাত মিন দুনিহিম হেজাবান। ফা আরসাল্না ইলাইহা রুহানা ফাতামাস্সালা লাহা বাশারান সাউইইয়ান।

সুতরাং সে তাহাদের হইতে (পরিবার পরিজন) পর্দা গ্রহণ করিল। সুতরাং আমরা তাহার দিকে আমাদের রুহকে পাঠাইলাম। সুতরাং তাহার জন্য উহা বাশার (আদম)-রূপে প্রকাশিত হইল।

রুহ যে বাশার (এখানে ইনসান শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি)-রূপ ধারণ করতে পারেন, এই আয়াতেই একটি স্পষ্ট দলিল পেলাম। রুহ যদিও স্বয়ং আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ যে বাশার-রূপ ধারণ করেন এই আয়াতটিই দলিল দেবার জন্য যথেষ্ট মনে করি। এবং রুহ যে কেবল বাশার-রূপই ধারণ করতে পারেন তা নয়, বরং রসুলও যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন তারও দলিলটি পেলাম। এখানে এই কথাটি বলা হয় নি যে, সুতরাং আমরা তাহার দিকে নফ্সকে পাঠাইলাম তথা ফা আরসালনা ইলাইহা রুহানা বলা হয়েছে, কিন্তু ফা আরসালনা ইলাইহা নাফসানা বলা হয় নি। (আমাদের অনুবাদ এতই হুবহু হয় যে ভাষার লালিত্য রাখতে কষ্ট হয়)।

আপনি যে কোনো কোরান-এর অনুবাদ ও তফসির খুলে দেখুন যে, মাশাল্লাহ, এই রুহ বলতে জিবরিল নামক ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে॥ বলা হয়েছে। অথচ আল্লাহ্ পাক কেবলমাত্র আদমের ভেতর রুহ ফুৎকার করেছেন। ইহা একটি কোরান-এর জাজ্বল্যমান স্পষ্ট দলিল। কেবল জিবরিল কেন, আল্লাহ্ সমস্ত ফেরেশতাকে এই বলে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তোমাদের জ্ঞান কি আদমের সমান? প্রতি-উত্তরে সমস্ত ফেরেশতারা একবাক্যে বলে ফেললেন, লা ইল্মালানা ইল্লা মা আল্লামতানা তথা আমাদের কোনো জ্ঞান নাই আল্লাহ্ যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত। পাঠক বাবা, আপনি সরল বিশ্বাসে যে কোনো জাঁদরেল আলেমের এই অনুবাদটি পড়ে জিবরিল ফেরেশতার কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ফেলবেন। কিন্তু ইহা যে একটি মারাত্মক এবং জঘন্য ভুল, এটা সেই মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারবেন না। এভাবেই কোরান-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অনেক স্থানে এমন উল্টাপাল্টা দেওয়া হয় যে, সরল পাঠক সত্য-মিথ্যার পার্থক্যটি আর বুঝে উঠতে পারেন না। ঢাকার পুরাতন শহরে অবস্থিত ভেজাল দুধের আড়ৎটির নাম রথখোলার দুধের আড়ৎ। এই ভেজাল দুধ খেতে খেতে পেট অনেকটা ভেজাল-প্রুফ হয়ে যায়। তখন পল্লীগ্রামে গিয়ে কোনো আত্মীয়-পরিজনের বাড়িতে দু-একদিন অবস্থান করে খাঁটি দুধ পান করলে পেট খারাপ হবার সমূহ সম্ভাবনা থেকেই যায়। ঠিক সে রকম ভেজাল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়ে পড়ে আসলটাকেই ভেজাল মনে হয় এবং নানা রকম প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা মনের মাঝে ভেসে ওঠে এবং এটাই স্বাভাবিক।

সুফি কবি আল্লামা ইকবাল এই জাতীয় কোরান-এর অনুবাদ ও তফসিরগুলো পড়ে একটি খাসা মন্তব্য করেছিলেন এই বলে যে, এই সকল আলেম-উলামাদের কোরানের অনুবাদ ও তফসিরের নমুনা দেখে আল্লাহ্, মহানবি এবং ফেরেশতারা সবাই অবাক। সুফি কবি আল্লামা ইকবালের উপর কাফের ফতোয়া দেবার প্রথম সূচনাটি এখান থেকেই শুরু হয়, তবে আলেম-উলামারা তখনও প্রকাশ্যে কিছু মন্তব্য করার সাহস পায় নি। কোরান-এর উনিশ নম্বর সূরা মরিয়মের একচল্লিশ নম্বর আয়াতের অনুবাদ : ওয়াজ্কুর ফিল্ কিতাবে ইব্রাহীমা। ইন্নাহু কানা সিদ্দীকান নাবীয়ান। তথা এবং জিকির (স্মরণ) করো কেতাবের মধ্যে ইব্রাহিমকে। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী (সিদ্দিকান) নবি।

কেতাবের মধ্যে ইব্রাহিমকে কেমন করে মনে করবে তথা স্মরণ করবে তথা জিকির করবে? কারণ তখন কেতাবের সন্ধান কোথায় পাবে, যদি উহা কাগজ অথবা অন্য কিছুতে লিখা থাকে? আর তা ছাড়া কেতাব পড়ার মতো অক্ষরপরিচয় তাঁর জানা ছিল না। তা হলে এই কেতাব বলতে কি আল্লাহ্র প্রকাশ ও বিকাশের অবিরাম ছুটে চলার গতিকে বুঝানো হয়েছে? যদি তাই হয়, তা হলে নুরময় কেতাব হতেই ইব্রাহিমকে জানবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ হজরত ইব্রাহিম আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে চলে গেছেন। আমরা দেখতে পাই, কোনো বিষয় জানার জন্য আল্লাহ কেতাবের

জিকির করার কথাটি বারবার বলেছেন। সুতরাং এই রহস্যলোকের নুরি কেতাবটি হতে কিছু জানতে হলে রহস্যলোকে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সম্ভব নয়। তা হলে অধ্যাত্মবাদকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়? আর যদি ধরে নিলাম উহা কাগজের কেতাব, কিন্তু সেই সময় কাগজ পাবার প্রশ্নই ওঠে না। আর ভাষাটিকে আক্ষরিক রূপদান করে সাজাবার মতো ভাষাজ্ঞানী কি তখন ছিল? তা হলে কি পরিষ্কার বোঝানো হচ্ছে না যে, ইহা এলমে লাদুনির কেতাব? তা হলে এলমে লাদুনিকে কী করে অস্বীকার করে ওহাবিরা এবং শিয়ারা? আরও উল্লেখ্য যে, কোরান-এ কেতাব বলতে কোথাও কোরান-কেই বুঝিয়েছে, আবার আল্লাহ্‌র প্রকাশ ও বিকাশের অবিরাম ছুটে চলার গতিকেও কেতাব বলা হয়েছে। সুতরাং একপেশে করে বুঝতে গেলেই ভুল করা হয়। সুফিবাদে বিশ্বাসী অনেকেই কোরান-কেও যে কোনো কোনো স্থানে কেতাব বলা হয়েছে এটা মানতে নারাজ। আবার পরক্ষণে আল্লাহর প্রকাশ ও বিকাশের অবিরাম ছুটে চলার গতিকেও যে কেতাব বলা হয়েছে এটাও অনেকে মেনে নিতে নারাজ। অনেকটা যারা শরিয়ত মানেন তারা মারেফত মানেন না, আবার যারা মারেফত মানেন তারা শরিয়ত মানেন না। কারণ আল্লাহ্‌র কালামে পাক কোরানুল হাকিম-এ উভয়ের সমন্বয়টি দেখতে পাই। যেমন আমরা জানি ওহি নবি-রসুলের কাছেই নাজেল করা হয়, অথচ হজরত মুসা (আঃ)-এর মায়ের কাছেও ওহি আসার কথাটি জানতে পারি এবং আরও অবাক হবার কথাটি হলো যে, সূরা নহলের ৬৮ নং আয়াতের প্রথমেই মৌমাছির কাছেও ওহি নাজেল করা হয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ওহি একটি মাত্র শব্দ হলেও তিনটি স্থানে তিন রূপ। তাই বলে একজন বিবেকবান মানুষ মৌমাছির নামের পরে 'আলাইহেস সালাতুস সালাম' ব্যবহার কখনোই করতে যাবেন না। কারণ যেহেতু মৌমাছির কাছেও ওহি নাজেল হয়, তাই বলে কি মৌমাছি আলাইহেস সালাতুস সালাম কি বলা যায়? না, যায় না।

কোরান-এর তিপ্পান্ন নম্বর সূরা নজমের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতের অনুবাদ ও সামান্য ব্যাখ্যা :

ওয়া আন্না হুয়া আদ্‌হাকা ওয়া আব্‌কা।

এবং নিশ্চয়ই তিনি (তোমাকে) হাসান (আদ্‌হাকা) এবং (তোমাকে) কাঁদান (আব্‌কা)।

ব্যাখ্যা : এই আয়াতটি পড়ার পর অবাক হই, কিন্তু এটা তো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কালাম, তাই মাথা পেতে মেনে নিতেই হবে। তবে একটি কথা মনে পড়ে বারবার আর সেই কথাটি হলো, বাংলার সহজ-সরল বাউল যখন লাল শালু কাপড় পরে খাল বা নদীর তীরে বা কোনো নির্জন স্থানে আপন মনে দোতারায় সুর তুলে গাইতে থাকে বাংলায় বিখ্যাত সুফি সাধক খালেক দেওয়ানের পিতা আলেফ দেওয়ান রচিত তুমি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ? জানতাম না এবং ঐ সরল-সহজ বাউলও হয়তো জানে না যে, এটা কোরান-এরই অনেকটা ভাবার্থ, এটা সূরা নজমের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতটির কিছুটা দর্শন গেয়ে চলছে।

কোরান কী অপূর্ব ভাষার শৈলীতে প্রকাশ করছে যে, একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌পাকই সবাইকে হাসান এবং সবাইকেই কাঁদান। আমরা অবশ্য কালামটিতে ব্রাকেট তৈরি করে আমাদের বুঝবার জন্য মানবজাতিকে বোঝাতে চেয়েছি। যদিও জিনজাতির কথাটি ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছি। কিন্তু কোরান বলছে, তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান। কালামটি কিন্তু সার্বজনীন। অবশ্য আমরাও সার্বজনীন বলতে কেবলমাত্র মানবজাতিকেই বুঝি। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের সার্বজনীন শব্দটির অর্থ হলো সৃষ্টিজগতের সবার বেলায় প্রযোজ্য। তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতের সবাইকে হাসান এবং সবাইকে কাঁদান। নবি সোলায়মান পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের ভাষা বুঝতেন। বুঝতেন এদের সুখ-দুঃখের ভাষা। বুঝতেন এদের হাসি আর কান্না। হুদহুদ পাখি তো বলেই ফেলল যে, আমি যা জানি নবিবর সোলায়মান তা জানেন না। একটু গবেষণা করুন। সব বিষয়ের গবেষণা চলছে এবং গবেষণায় নূতন নূতন বিষয় বেরিয়ে আসছে আর আমরা সেইসব দেখে অবাকের পর অবাক হচ্ছি। গবেষণায় ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু থামিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়। কারণ কোরান গবেষণাকে উৎসাহ দেবার জন্য বলছে যে, সমস্ত গাছগুলো যদি কলম হয়, আর পানিগুলো কালি হয়, তবুও কোরান-এর ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না। আমরা মতের বিভিন্নতার দরুন মতভেদ দেখতে পাই। তবে হিংস্রতা, বর্বরতা এবং জানমালের নিরাপত্তার প্রশ্নে মহানবি আগেই সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, সে-ই মুসলমান, যার হাত সর্বপ্রকার আমানত এবং অনিষ্ট হতে মুক্ত থাকে। ইতিহাস খুলে দেখুন যে, মুসলমানরা যখন সভ্যতার শীর্ষে, তখন ইউরোপ আর আমেরিকার অবস্থাটি কেমন ছিল? জংলি রেড ইন্ডিয়ানদের বাস ছিল আমেরিকায়। এটা সবাই জানে। ব্রিটেন গোঁয়ারগোবিন্দ আর বর্বরতার অন্ধকারে যে ছিল তার অনেক অনেক প্রমাণ পাই। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে এই সত্য কথাটি প্রচার করার দরুন এই সেদিনও কত বড় বড় জ্ঞানীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং আরও কত কী! আর আজ? যে সভ্যতার মশালটি মুসলমানের হাতে ছিল সেই মশালটি এখন গোঁয়ারগোবিন্দদের হাতে শোভা পাচ্ছে। আর আমাদের স্থান কোথায় নেমে গেছে সেটাও কি বলতে হবে? হয়তো যুক্তির খাতিরে বলতে পারেন যে, আল্লাহই যখন হাসান এবং কাঁদান তা হলে তাদেরকে হাসাচ্ছে আর আমাদেরকে কাঁদাচ্ছে! (সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে যখন আওলাদে রসুল ইমাম জয়নুল আবেদিন (আঃ)-কে মোয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ সূরা আল ইমরানের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতটি শুনিয়ে দিলো, তখন ইমাম সাহেব কেবলমাত্র একটি কথাই বলেছিলেন যে, শয়তানের মুখেও আজ আমাকে কোরান-এর বাণী শুনতে হলো)। এর উত্তর আমার জানা নাই। তবে আল্লাহ্‌ এটাও বলে দিয়েছেন যে, যে জাতি তার নিজের ভাগ্য নিজেরা পরিবর্তন করে না আল্লাহ্‌ সেই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না॥বলা হলে এখানে ভাগ্য পরিবর্তনের কথাটি আসে কেমন করে? ভাগ্য তথা তকদির দুই প্রকার : একটি বদলানো যায় এবং আর একটি যায় না। তথা মুবরাম তকদির নির্দিষ্ট। মুবরাম তকদিরের পরিবর্তন হয় না। (তকদির বিষয়টি নিয়ে তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিত লিখার আশা রাখি। বাকি আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা।)

কোরান-এর পঞ্চান্ন নম্বর সূরা আর রহমানের ৫০ নম্বর (ছোট্ট একটি) আয়াতের অনুবাদ ও সামান্য ব্যাখ্যা : ফীহিমা আইনানে তাজরিয়ানে।

তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে (ফিহিমা) প্রবহমান (তাজরিয়ানে) দুইটি চক্ষু (আইনানে)।

ব্যাখ্যা : আইনানে শব্দটিকে ঝরনা লিখেছেন সবাই প্রবহমান শব্দটি থাকার কারণে। অথচ ইহার অর্থ হলো দুইটি চক্ষু অথবা দুইটি কূপ। কূপ-কে অনুবাদকারী গ্রহণ করেন না। কারণ কূপে প্রবাহ থাকে না। কিন্তু চক্ষুতে যে প্রচণ্ড বোবা প্রবাহটি বিদ্যমান উহা অনেকেই বুঝতে পারেন না। তাই ঝরনা

অথবা প্রস্রবণ শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হন। অথচ ঝরনা অথবা প্রস্রবন শব্দটির নাম-গন্ধও শব্দটিতে নাই। আমি পনেরটি আরবি ডিকশনারি খুলে একটিতেও ঝরনা অথবা প্রসবণ শব্দটি পেলাম না। চোখের প্রবাহ যে সাগরের প্রবাহ হতে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং প্রবহমান নদী-নালার তো চোখের প্রবাহের সামনে তুলনাই চলে না। অনুবাদক দুইটি চোখ, দুইটি কূপে প্রবাহটি দেখতে না পেয়ে দুইটি চক্ষুকে দুইটি প্রস্রবণ অথবা ঝরনা অনুবাদ করতে বাধ্য হন। অনুবাদক অকপটে যদি লিখে দিতেন যে, এই আয়াতটির হুবহু অনুবাদ করে গেলাম, কিন্তু অর্থটি বুঝতে পারলাম না, তা হলে অনুবাদকের মহত্ত্বই প্রকাশ পেত। 'সব কিছু বুঝে গেছি', বলাটা যে পাপ এটা প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে দার্শনিক সক্রেটিস বারবার বলে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। বুঝতে পারলাম, না বলার মাঝে মূর্খতা নাই, আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে বুঝবার দরজাটি খুলতে পারে তারই অকপট স্বীকৃতি। চীন দেশে একটি প্রবাদ আছে, সামান্য জিহ্বাটি কত মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু দুইটি চক্ষুর যে কত শক্তিশালী প্রবাহ আছে এবং দুইটি চোখ অন্ধ থাকলে সভ্যতার প্রবাহটি কি ধেই ধেই করে এগিয়ে যেতে পারত? দৈহিক প্রেম এবং আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রশ্নেও বড় বড় কবিরা বলেছেন যে, আখুকা এক ইশারাই কাফী হ্যায়। তথা চোখের একটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট। ধনাঢ্য মাহ্ওয়াল, মাটির হাঁড়িপাতিল বানায় এমন কুমোরের মেয়ে সোহনির একটি দৃষ্টিতেই প্রেমসাগরে ডুবে মারা গেলেন। শরিয়ত এবং মারেফতের মিলন পাই কোরান-হাদিসের বাণীতে। আমরা ইচ্ছা করে একপেশে হয়ে যাই। ওহাবিরা তো মারেফতের হাদিসগুলোকে একদম মানে না। এ জন্যই হয়তো ঝানু ওহাবি আর ঝানু শিয়া গবেষকদের সাহাবা আবু হুরায়রাকে যা-তা মন্তব্য করতে দেখি। কিন্তু সূরা কাহাফের খিজির যে এলমে গায়েব জানতেন সেই বিষয়টি সযতনে এড়িয়ে যান। এড়িয়ে যান সূরা আল ইমরানের ৪৯ নম্বর আয়াতের এলমে গায়েব জানার পরিষ্কার দলিলটি। এক জাঁদরেল ওহাবি পণ্ডিতকে বলেছিলাম যে, মৃতকে জীবিত করাটিকে আপনারা বলেন মৃত আত্মাকে জ্ঞান দিয়ে জীবিত করেন। আপনাদের এই ব্যাখ্যা মেনে নিলেও একটি কথা থেকে যায়, আর সেটা হলো এই রকম জ্ঞান দেবার বিষয়টি যে যে স্থানে কোরান-এ আছে সেখানে কিন্তু 'বেইজ্নিল্লাহ্' তথা আল্লাহর হুকুমে কথাটি নাই, কিন্তু লাশের মধ্যে প্রাণ দেবার প্রশ্নে 'বেইজ্নিল্লাহ্' তথা আল্লাহ্র হুকুমে থাকতেই হবে। আর মাটি দিয়ে বানানো পাখিতে ফুৎকার দেবার সাথে সাথে জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে যাবার কথাটি যে কোরান বলছে সেটার ব্যাখ্যা কী দিবেন? গোয়েন্দারা বলেন যে, অপরাধী কিছু না কিছু সামান্য হলেও অপরাধের চিহ্ন রেখে যায় এবং চিহ্ন দ্বারা যদি অপরাধী ধরা পড়ে তো কিছুই বলার থাকে না। তখন মাথা নিচু করে কেউ অপরাধ স্বীকার করে, আবার কেউ এই জলজ্যান্ত প্রমাণ দেখেও অস্বীকার করে। একজন এই বিষয়টি মানবে কি মানবে না, তা জন্মের পূর্বেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। মেশকাত শরিফ-এ তকদির বিষয়ে হাদিসগুলো পড়ে দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। সুতরাং গালি না দিয়ে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। আর এলমে গায়েবের কথা? শত দলিল দাঁড় করালেও ওহাবিরা মানবে না। তবে যদি কেবলমাত্র একটি দলিল দিতে চাই, আর তা হলো ফারুকে আজম হজরত ওমর ফারুক মসজিদে খুৎবা পড়ার সময় বহু দূরে যুদ্ধে রত সাহাবাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আশা করি এই দলিলটি যথেষ্ট। কারণ সাহাবার শান যদি এমন হয়, তো গায়েব সম্পর্কে মহানবির শান কেমন হতে পারে?

বনি ইসরাইল সূরাতে মুসা ও খিজিরের বিষয়টিতে বলা হয়েছে, আমি তাকে (খিজির) ইলমে লাদুনি দান করেছি। খিজির নবিও নন, রসুলও নন। তিনি ওলি। কোরান-এর সূরা আল ইমরানের ঊনপঞ্চাশ নম্বর আয়াতের শেষে হজরত ইসা (আঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা কী খাবার খেয়ে এসেছ তা আমি বলে দিতে পারি এবং তোমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে কোথায় কোন জিনিস রাখা আছে তাও বলে দিতে পারব। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, এই একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের মধ্যে কারো তার নিজ বাড়িতে কোথায় কী রাখা আছে তা বলা এক প্রকার অসম্ভব বলতে চাই। কোরান-এর এই আয়াতগুলো কি এলমে গায়েবের প্রকাশ্য প্রমাণ বহন করে না? একইভাবে মুসলিম জাতির
পিতা হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে আল্লাহ্ কোরান-এ বলছেন যে, 'আমি এইভাবেই ইব্রাহিমকে আকাশ ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত আমার (আল্লাহর) বাদশাহি অবলোকন করাই।'

তফসিরে রুহুল বয়ান এবং তফসিরে কবির এবং তফসিরে খাযেন-এ বর্ণনা করা হয়েছে, নবি হজরত ইউসুফ (আঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে বিগত ও ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে তোমাদের রিজিক এবং যাবতীয় অবস্থা সম্বন্ধে বলে দিতে পারি। তোমাদের জন্য আসা খাদ্যশস্য কোথা হতে এলো এবং এরপর কোথায় যাবে, আমি এই বিষয়টিও জানি এবং তোমাদেরকে জানিয়েও দিতে পারি। আমি এটাও পরিষ্কার বলে দিতে পারি যে, এই খাবার গ্রহণে তোমাদের উপকার হবে কি ক্ষতি সাধিত হবে।' এলমে গায়েব জানা না থাকলে এ রকম কথাগুলো বলা অসম্ভব।

ফারুকে আজম হজরত ওমর ফারুক হতে এই হাদিসটি মেশকাত শরিফ-এ আছে যে, মহানবি সৃষ্টির আদিকালীন সংবাদ দিচ্ছিলেন। এমনকি বেহেশতি এবং দোযীদের নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া অবধি যাবতীয় ঘটনাবলির বিস্তারিত বর্ণনা করেন। সাহাবা হজরত হুজাইফা বলেছেন যে, মহানবি উল্লেখিত সমাবেশে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছুর খবর দিয়েছেন। তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই সেই সকল বর্ণনা মনে রাখতে পেরেছেন। মেশকাত শরিফ-এ আছে যে, সাহাবা হজরত সওবান বলেছেন যে, মহানবি বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহ আমার (মহানবি) সামনে পৃথিবীকে এমনভাবে সংকুচিত করে দিয়েছেন যে, আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত হতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত কিছু অবলোকন করেছি।' মেশ্কাত শরিফ-এ আছে যে, সাহাবা হজরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েয বলেছেন যে, মহানবি বলেছেন 'আমি আল্লাহকে সুন্দরতম আকৃতিতে দেখেছি।

তিনি (আল্লাহ) তাঁর কুদরতের হাত আমার বুকের উপর রাখেন, যে হাত পাকের সুশীতল পরশ আমি আমার অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করি এবং এর ফলে আমি আসমান-জমিনের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি।' মেশ্কাত শরিফ-এ বর্ণিত আছে যে, হজরত উম্মুল ফজল ভবিষ্যদ্বাণী করে এরশাদ করেন, 'খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমাতুজ জোহরা (আঃ)-এর কোলে একজন পুত্রসন্তানের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে পুত্রসন্তান উম্মুল ফজলের কোলে লালিতপালিত হবেন।' বুখারি শরিফ হতে সাহাবা হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন যে, 'মহানবি একদিন দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কবর দুইটিতে আজাব হচ্ছিল। তিনি (মহানবি) সঙ্গী সাহাবাদেরকে উদ্দেশ করে বলেন, এই কবর দুইটিতে আজাব হচ্ছে। কিন্তু কোনো বড় গুনাহ্র জন্য

নয়।' তখন মহানবি একখানি খেজুরের কাঁচা ডাল নিয়ে সেটিকে ভেঙে দুই টুকরা করলেন এবং সেই দুইখানিকে একটি করে এক এক কবরে পুঁতে দিলেন এবং এরশাদ করেন যে, যতদিন পর্যন্ত এই খেজুরের ডাল শুকিয়ে না যাবে, ততদিন পর্যন্ত এদের কবরের আজাব কম হবে। মসনদে ইমাম হাম্বল হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবি তাঁদের কাছে এমনভাবেও বর্ণনা করেন যে, পৃথিবীতে একটি পাখির ডানা নাড়ার কথাও সেই বর্ণনা থেকে বাদ পড়ে নি। তিরমিজি শরিফ-এও এই বর্ণনাটি আছে, মহানবি বলেন, 'তখন প্রত্যেক কিছু তাঁর (মহানবি) কাছে এমনভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি (মহানবি) এইগুলি চিনতে পেরেছেন।' আল্লামা জুরকানি এই হাদিসখানি সম্বন্ধে তাঁর শরহে মাওয়াহেব কিতাবে লিখেছেন যে, মহানবির সামনে দুনিয়াকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যার ফলে তাঁর (মহানবি) দৃষ্টি সেই সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করেছে। সুতরাং তিনি (মহানবি) পৃথিবীকে এবং যা কিছু কেয়ামত পর্যন্ত ঘটতে থাকবে এমনভাবে দেখতে পেয়েছেন যেমনভাবে তাঁর (মহানবি) হাত মোবারককে দেখতে পান। হাত মোবারকের তুলনা এই কারণেই দেওয়া হয়েছে যে, কোনোরকম দিব্যদৃষ্টি বা কল্পদৃষ্টি নয়, অতি বাস্তবতা দিয়েই তিনি (মহানবি) সেই সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন।

মেশ্‌কাত শরিফ-এর 'মাসাজিদ' অধ্যায়ে জলিল কদর সাহাবা এবং আসহাবে সুফ্‌ফার অন্যতম প্রধান আবু জর গিফারি হতে বর্ণিত একখানি হাদিসে উল্লেখিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের আগের দিন মহানবি কয়েকটি স্থান তাঁর হাত মোবারকের আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে এরশাদ করেন, 'এইটা অমুকের (ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে) পতিত হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান। একই সঙ্গে তিনি ময়দানের আরও কতিপয় স্থান নির্দেশ করে দেখিয়ে বলেন, এখানে, এখানে।' পরের দিন যুদ্ধ সংঘটিত হবার সময় দেখা যায় যে, তাঁর (মহানবি) নির্দেশিত স্থানসমূহে সাহাবাগণ শাহাদত বরণ করেন এবং পতিত হন– এর বাইরে একজনও নয়।

মেশ্‌কাত শরিফ-এর 'মুজিজাত' অধ্যায়ে হজরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, সে একদিন একটি নেকড়ে বাঘকে বলতে শুনেছে (নেকড়ে বাঘের জবান খুলে গিয়েছিল এর চাইতে আশ্চর্যজনক আর কী আছে!) যে, ওই দুই মরুপ্রান্তরে সম্মানিত ব্যক্তি (মহানবি) আছেন, যিনি তোমাদেরকে অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহ জ্ঞাত করাবেন।

দজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণকারীদের বিষয়ে আলোচনায় মহানবি বলেছেন যে, 'আমি তাদের নাম জানি, তাদের বাপ-দাদাদের নামও জানি ও তাদের ঘোড়াগুলির রং সম্বন্ধেও জানি। তারাই হবেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার।'

মেশ্‌কাত শরিফ-এর 'মানাকিবে আবি বাকারিন ওয়া উমারা' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, উম্মুল মোমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা একদিন মহানবির নিকট আরজ পেশ করেন, 'আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ! এমন কেউ আছেন কি, যার নেকিসমূহ আকাশের তারকারাজির সমসংখ্যক হবে?' মহানবি বললেন, 'হ্যাঁ, এবং তিনি হলেন ওমর।'

তফসিরে খাজেন-এ বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবি বলেছেন, মেরাজ রজনীতে 'আমার উম্মতকে আপন-আপন মাটির আকৃতিতে হাজির করা হয়েছে, যেমনভাবে হজরত আদমের নিকট হাজির করা হয়েছিল। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে কে আমার উপর ইমান আনবে, আর কে আনবে না।' মহানবির এই ঘোষণা কাফেরদের গোচরীভূত হলে তারা বিদ্রূপাত্মক হাসিসহকারে বলেছিল, 'মুসলমানদের নবি সমস্ত মানুষের জন্মের আগেই কে কাফের আর কে মোমিন ঘোষণা দিয়ে বসে আছেন, অথচ আমরা তার চারপাশে অবস্থান করি, আমাদেরকে তিনি চিনেন না।' কাফেরদের এই উক্তি মহানবির নিকট পৌঁছালে তিনি মসজিদে নববিতে মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন এবং ঘোষণা করেন, 'একমাত্র প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য। এই সকল লোকদের এমন কী হলো যে, তারা আমার জ্ঞান নিয়ে সমালোচনা করে। এখন থেকে কাল কেয়ামত পর্যন্ত যে কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন, আমি অবশ্যই তাদের বলে দিব।'

ইফতার বিষয়ে কতিপয় হাদিস

আমরা সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ নামক বইটির তৃতীয় খণ্ডে ইফতার, সাওম (রোজা) ও অজুর (আধ্যাত্মিক) শরিয়তভিত্তিক মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশদ আলোচনার আশা রাখি। তাই এখানে ইফতার বিষয়ে মাত্র তিনটি হাদিস আপাতত তুলে ধরলাম। হুনায়েনের যুদ্ধটি ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ পৃথিবীর ঝানু সমরবিদেরা এই যুদ্ধে কেমন করে মুসলমানরা মহানবির নেতৃত্বে জয়লাভ করেছিলেন সেই বিষয়ে বিস্মিত। যখন কাফেররা মুসলমানদেরকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছিল তখন মহানবি একটি খচ্চর হতে অবতরণ করে একমুষ্টি বালু হাতে নিলেন এবং এই কালামটি : ইয়া শাতিল ওজুহু অর্থাৎ 'হে চেহারা (মুখমণ্ডল)-গুলো, বিবর্ণ হয়ে যাও' পড়ে বালুতে ফুঁ দিয়ে প্রতিপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাতে সকলেই পাথরের মতো স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই বিষয়ের উপর বিশদভাবে আলোচনা করার আশা রাখি পরবর্তীতে। কেননা, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ একটি আধ্যাত্মিক, অলৌকিক বিষয় বলে ঝানু সমরবিদেরা মন্তব্য করেছেন।

১. আন্ সাহ্লিন কালা কালা রসুলুল্লাহ্ (সা) কালাল্ লাহু তায়ালা আহাব্বু, এবাদি ইলাইয়া আজালুহুম ফেতরান। (তিরমিজি)। সাহাল হতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, আমার নিকট আমার বান্দাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তিই সর্বপেক্ষা প্রিয় (আহাব্বু এবাদি ইলাইয়া) যে তাহাদের মধ্য হইতে ইফতারকে তাড়াতাড়ি করে (আজালুহুম ফেতরান)।

২. আন সাহ্লিন কালা রসুলুল্লাহ্ (সা) লা ইয়াজালুন্ নাসু বেখায়রিন মা আজজেলুলী ফেতরান। (বুখারি ও মুসলিম)। সাহাল হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মানুষের উত্তম (দিকটি) দূরীভূত হইবে না, (লা ইয়াজালু) যদি তাহারা ইফতারে তাড়াহুড়া না করে (মা আজজেলুনা ফেতরান)।

৩. আন উম্রিন কালা কালা রসূলুল্লাহ্ (সা) ইজ্ আক্বালাল্ লাইলু মিন হাহুনা ওয়া আদবারান নাহারু মিন হাহুনা ওয়া গারাবাতিশ শামসু ফাকাদ আফতারাস সায়েমু। (বুখারি ও মুসলিম)। ওমর হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, 'যখন রাত্রি আমাদের নিকট হইতে (মিন হাহুনা) অগ্রবর্তী হয় (আক্বালা) এবং দিবস যখন আমাদের নিকট হইতে পিছাইয়া যায় (আদ্বারা) এবং সূর্য ডুবিয়া যায় (গারাবাতিন) সুতরাং অবশ্যই রোজাদার (সায়েম) ইফতার করিবে।'

সুফিসাধক আল্লামা জামির একটি কালাম-এর ভাবার্থ

তেরে ইশ্কে মে হ্যায় মেরা আব ইয়ে আলম।
তোমার প্রেমে আমার সমস্ত সত্তা বিলীন হয়ে আছে।
কাভি জাবালাব হু কাভি শেক্লে মাতম।
কখনো আমি সৃষ্টির সৌন্দর্যে বিভোর থাকি, কখনো আমি বিচ্ছেদ কান্নায় বিবর্ণ হয়ে যাই।
ইয়ে কাহ্কে কার কারু ম্যায় তেরা খায়রে মাকদাম।
এটা আমি কিভাবে বলব যে, আমি তোমার ভালোবাসায় ফিরে আসব?
বানোকে সিনানাতে জিগার মি ফারোশাম।
যুগের আবর্তনে আমি তোমাকে কিভাবে ধারণ করব?
বা তেগে আদায়ে তো সারমি ফারোশাম।
আমার মাথার উপর তো উলঙ্গ তলোয়ার রয়েছে, আমি তোমাকে কিভাবে ধারণ করব?
ব শাওকাতে জা বালাব আমদ তামামী।
সৃষ্টির সৌন্দর্যের গতিময়তা নিয়েই আমি আমার শেষ পরিণতিতেও তোমার নিকট ফিরে আসি।
ফা কুমকুম ইয়া হাবিবী কাম তানামী।
সুতরাং হে রাজার রাজা বন্ধু আমার, আর কতকাল ঘুমাবে?
হামা পায়গাম্বারো দার জুসতো জোয়াম।
আমার সুসংবাদদাতাকে আমি আর কত কাল খুঁজব?
খোদা দানাদ্ কে দো বারচে মাকামী।
খোদাই ভালো জানেন যে, আমার অবস্থানটি কোথায় হবে?
হামা মা বার সারে জামা বাতানকো।
আমার দেহের পোশাকটি কি আমার মর্যাদা অনুপাতে হবে না?
ফাকাদ সার্ওয়ে বা রুখ মাহে তামামী।
সুতরাং শেষ পরিণতিতে আমার মর্যাদাপূর্ণ চন্দ্রমুখটির কী হবে?
উমিদে খাল্লাতে শাহী না দারাম।
শাহী দরবারে বন্ধুত্ব ছাড়া প্রবেশের অনুমতি আশা করা যায় না।
বা সারকারে সেদো গাহে গোলামী।
পীরের দরবারে ফকিরিই একমাত্র গোলামি।
বা হুসনে এহ্তামামাদ্ ইয়ারে জামী।
হে জামি, তুমি তো পীরের সৌন্দর্যের মাঝেই অভিভূত হয়ে আছ।
তোফায়েলে দীদ জারা ইয়াবদ্ তামামী।
আমার শেষ পরিণতিতে আমার প্রতি একটু দয়ার দৃষ্টিতে দেখিও।

হজরত বাবা আমির খসরু রচিত কালাম-এর ভাবার্থ

বুয়ে দিল আজ গুবারে মি আয়েদ।
আমার অন্তর তোমার সৌরভে আজ সম্পূর্ণ ভরপুর, যখন আমি নিজেকে পেয়েছি তোমাতে।
শায়েদাঁ শাহ সাওয়ারে মি আয়েদ।
আমাকে তোমার মাঝে বিক্রি করতে পেরেছি বলেই তো, রাজাধিরাজের শুভ আগমন হয়েছে।
খাবারাম রাশিদে ইন্‌শাব কে নিগায়ে খাহি আমদ।
আমার ধারণাও ছিল না যে, রাজাধিরাজের গোপন বাণী ধ্যানসাধনায় আমিকে তাড়িয়ে দেবার পরেই আসবে।
সারে মান ফেদায়ে রাহে কে সাওয়াবে খাহি আমদ।
সবটুকু মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার পর দেখি পরম আপনরূপে মূর্তিমান হয়ে আসেন আমারই মাঝে।
হামা আ হুয়া সেহেরা সারে খুদী নিহাদা কারদি।
পরম তাঁর নূতন রূপে নববধূর মতো আগমন করেন যখন আমিকে আমি নাই করতে পেরেছি।
বাউদি কে আঁকে বুঁদে বাসিতারে খাহি আমদ।
পরমের আগমন আমারই মাঝে আসে যখন আমিটা আর আমার মাঝে থাকে না।
কাশাসে কে ইশকে দারাদ্ না গুজারে তাক্‌মাদিদা।
ইশকের বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করে নিতে না পারলে পরমের দর্শন লাভ হয় না।
বাজানা নাজার আগার না আয়ি বা মাজারে খাহি আমদ।
আমার মাঝে আমি থাকলে পরম আসেন না, আর না থাকলে আমি সবার তীর্থস্থানে পরিণত হই।
বয়াক আহ্‌মদাল অজুদে দিল দ্বীনও সবরো খসরূ
আমার অস্তিত্বের সবটুকু এমনকি খসরুর অন্তর এবং ধর্মটিও।
চে শাবাদ আগার বাগিসা দোসেদারে খাহি আমদ।
পরমের দরজায় আসলে পর সামান্য চাওয়া-পাওয়াটুকু সঙ্গে রাখা যায় কি!

তিনটি কবিতা/শাহ সুফি সাইয়েদ মোহাম্মদ নাঈম

আমার প্রাণপ্রিয় বাবাজান শাহ সুফি সাইয়েদ মোহাম্মদ নাঈম সাহেবের আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর রচিত তিনটি কবিতা তুলে ধরলাম। যদিও বাবাজানের অনুমতি নিতে পারি নি। বাবাজান চট্টগ্রামের বিখ্যাত বারো আউলিয়াদের প্রধান সাইয়েদ মাহী সাওয়ারের প্রত্যক্ষ বংশধর। উনার পিতামহ বেলায়েতের পরশমণি সাইয়েদ শাহ সুফি বাবা আবদুল লতিফ আমানটুলী, যিনি বিশ্ব দরবার শরিফ আমানটোলা খানকা শরিফের প্রতিষ্ঠাতা। চট্টগ্রামের মীরেরসরাই উপজেলায় অবস্থিত এই বিশ্ব দরবার শরিফ।

ভেদ রহস্য-১
এ কি খেলা খেলছো তুমি, মাথায় চক্কর মারে তোমার মকরামি দেখে।
মক্করের মক্কর তুমি, চক্করের গোলক ধান্দায় চোখে যে সরষে ফুল ফোটে।
কত দোষ দেখতে পাই, তবু তোমার দোষ নাই, কোরানে তার সাফ
জবাব পাই।
তুমি নিখুঁত, সৃষ্টিও নিখুঁত, ভুলের কিছু নাই, সূরা মুলকের বাণীতে সব
কিছু যে ভুলে যাই।
না বুঝে অবুঝ মন দেয় গালি, তর্কের খাতায় কথার কোনো উত্তর নাই।
আজাজিল ফেরেশতার সরদার, একটি হুকুম না মেনে হয় শয়তান,
না মানার কথাটি শেখালো কোন শয়তান? ভেবে হই পেরেশান।
শয়তানের আগে শয়তান নাই, নদীর মিলন সাগরে পাই।

খাল নদীতে মিশে, নদী সাগরে মিশে, সাগর কোথায় মিশে এর জবাব চাই।
শয়তানের যত দোষ যে খাসা একটা নন্দ ঘোষ
শয়তানের আগে শয়তান কে ছিল প্রশ্ন করাটা যে বড় দোষ।
সব গোমর ফাঁক হয় সবার চোখ খুলে যায়
বুঝেও না বুঝার করি ভান, ভেদ রহস্য চক্কর খায়।
আনা খায়রুম মিন হু, উত্তম আমি আদম হতে,
কে শেখালো বাণীটি? খোদা তোমায় দোষ দেই কোন মতে।
শাস্তির কথায় পরান কাঁপে, 'জি হ্যাঁ, হুজুর' করি সবে।
তোমার প্রেমিক ভয় করে না তাই বলে ফেলে সবার কাছে।
সর্ব দোষে দোষী তুমি, কালাম পড়ে পরিষ্কার বুঝি
ভীতু বলে তুমি দয়াল প্রেমিক বলে, ভেদ বুঝি না আমি।
ঢাকনা দিয়ে ঢাকতে চাই, তবু কেন গন্ধ পাই?
সুফি নাঈম বলে এসব কথা বলতে নাই।
প্রেমিক যদি হতে চাও আপন কাঁধে সব দোষ মাথা পেতে লও
খোদাকে না দুষে আপনাকে দোষ, হাসি মুখে সব বিষ পান করে নাও।
ঐ বিষের জ্বালায় মাওলা পরাবে আপন হবার ফুলমালা
মনসুর কয় আনাল হক। এক বিনে দুই আর থাকে না তখন
ফানার মোকামে পীর-মুরিদ এক হয় শের্ক-বেদাতের হয় মরণ।
সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফা কানা কাবা কাওসাইনে আও আদনা
আহাদ আর আহ্মদ এক হয়, ওহাবি আর শিয়া তো তা বোঝে না!

ভেদ রহস্য-২
রূপকথার গল্প শুনতে লাগে বড় মজা
সত্যকথার সত্য শুনতে লাগে তেমন তিতা,
যদি না থাকে মন ঘরে ভক্তি, ভণ্ড হয় কামেল পীর
মনের ঘরে সোনা হয় পিতল এ ভেদ যে কত গভীর।
আসল ফেলে নকল ধরে গলাবাজি করছে যারা
তকদিরের লিখন কপালে নাচে খণ্ডাবে কেমনে তারা?
লিখন-পড়ন জ্ঞান-গবেষণায় পাবে তুমি অনেক সভ্যতা
হেরা গুহায় ধ্যানসাধনায় পাবে তুমি আপনার ঠিকানা।
হাজার সালাম জানাই জ্ঞান-গবেষণার অবাক যত ফল
তৃপ্তি আছে, শান্তি আছে, মরীচিকায় আছে মেকি জল!
তা না হলে কি এত কিছু পেয়েও পায় না কিছু
দেহঘরে আত্মা কাঁদে কেন ছোটে কামেল গুরুর পিছু।
আপনাকে চিনতে হলে হয় না দরকার জ্ঞান-বিদ্যার ধমক
গুরুকে ভ্রূ-যুগলে, বাম বুকে সদাই যদি রাখতে পারো
সব রহস্যের জট খুলে দেখতে পাবি আপন চমক।
ঈসা, মুসা, বুদ্ধ, কৃষ্ণ সবাই করেছে আপন সাধন
মহানবির মহাবাণী আপন আর রবেতে থাকে না কোনো বাঁধন।
দিস না ফেলে পুঁথির বিদ্যা একমনে গবেষণা চালিয়ে যা
না হলে পিছিয়ে থাকবি এই দুনিয়ায় দাম পাবি না এক পয়সা।
ফিকির আর ফকির বাম আর ডান হাত
একটা ফেলে আরেকটা ধরলে বোকার স্বর্গবাস।
মন বাঁধ, শক্ত হও, কাঁধে লও ইবনে সিনা আর রুমি

সুফি নাঈম বলে এক কাঁধে আমার বিজ্ঞান, অপরটি সুফি।

ভেদ রহস্য-৩
গোপনের গোপন কথা মন দিয়া শোন জনগণ
মাথায় হাত, চোখে জল, মনে ভাসে যত গণ্ডগোল।
না মানিয়া হুকুম আদম-হাওয়া গন্ধম খাইলো রে॥
দোষ না করিয়া তাদের দোষে হইলাম দোষী যে।
তালা ঝুলিয়ে দাও মুখে, যুগের ভাষায় ভেটো মারে
তুমি আল্লা, আমি বান্দা, পারি না তোমার ভেদ বুঝিতে।
সূরা মুলকের মা তারাফি খাল্‌কির রাহ্‌মানি মিন তাফাউত
বাণীটি শুনে মানে বুঝি, ভেদ রহস্য ঘাঁটতে গিয়ে হই ফতুর।
কামেল ওলিকে প্রশ্ন করলে হাসে মনে মনে
এজিদকেও গালি দেয় না খাজা বাবা, শুনতে কেমন লাগে!
বাবার পাপ ছেলেকে দাও না তুমি, পাপ-পুণ্যের হিসাব নেবে প্রতিজনের কাছে
মরণ কেয়ামতে পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখতে পাবে সবার হাতে হাতে।
এ কী আজব খেলা খেলছো তুমি ভবের বাজারে?
ভেবে পাই না পার-কূল জবাবটি থেকে যায় আঁধারে।
আদম-হাওয়া বারণ করা গাছের মজা লয় অবশেষে,
দুনিয়া নামক জেলখানাতে ফেলে দাও সেই অপরাধে।
জান্নাতে যাই নি আমরা, মানা করা গাছের মজা তো অনেক পরের কথা,
তবে কেন আগমন এই দুনিয়ায় জীবন রহস্য পড়ছে না যে ধরা।
যার যার হিসাব সে সে দেবে আমলনামা উঠে আসবে হাতে
তবে কেন আদম-হাওয়ার হিসাব পড়ছে তোমার আমার কপালে?
এই কথার উত্তর চাই, কোরানের বাণীতে এমন কথা নাই।
উত্তরের উত্তর চাই, বিদ্যার খাল ডোবাতে ডুবিয়ে যাই।
সুফি নাঈম ভেবে হয় পেরেশান পাগল হবার পথে
একজনের বোঝা বইবে না অন্য জনে এই কালামটি শুনে।

তিনটি কবিতা/ অধ্যাপক জামাল

ইমাম হোসাইন
শত কোটি প্রণাম, হে হোসাইন, তোমায়।
তুমি জ্বালিয়ে দিয়েছ প্রেমের অনল
রক্তে রাঙানো হাহাকার করা কারবালায়।
তোমার সেই অনল ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময়
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে
সারা বিশ্বের প্রেমিকের হৃদয়।

তোমায় যারা শহিদ করেছে কারবালায়
ছিল না তারা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান
ছিল তারা দাড়ি-টুপিওয়ালা মুসলমান।
এজিদের তাঁবুতে আজান হয়েছিল

হুসাইনের তাঁবুতেও তা-ই,
সীমারের তাঁবুতে রুকু-সেজদা
হুসাইনের তাঁবুতেও তা-ই,
কাকে বলিবে নামাজি জাহান
কাকে বলিবে বেইমান?

সাহাবি বলিব কাকে আমি,
মুসলমান বলিব কাকে?
সেদিন হোসাইনের বিরুদ্ধে একুশ হাজার
সাহাবি অস্ত্র ধরেছিল মাঠে,
তারা ছিল মোহাদ্দেস, মোফাচ্ছেরে জামান,
হাফেজ, কারী, মাওলানা,
এখনও ফরমান মাওলানা সাহেব
করা যাবে না কোনো মন্তব্য
সাহাবিরা যে আকাশের নক্ষত্রতুল্য।
হোসাইন বলেছিল কারাবালায়
আমি কী অপরাধ করেছি
যে হত্যা করবে আমায়?
তোমাদের মধ্যে একজনও মুসলমান নেই
যে সাহায্য করবে আমায়?
বাণী শুনে এজিদ থেকে চলে এলেন
হুর, হুরের ছেলেসহ তেত্রিশ জন
যুদ্ধ করে শহিদ হলেন তাঁরা
মুসলমান তাঁরা, না সেই সাহাবারা?
সেই সাহাবারা নবির বংশের রক্তে
লাল করেছিল কারবালা
তবু হোসাইন, তুমি মাথা নত করো নি,
তোমার প্রেমিকেরাও করবে না
জনম জন্মান্তরে।
তুমি দেখিয়ে দিয়েছ সূক্ষ্মভাবে
আসল আর নকলের কত ফারাক
তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ
দাড়িটুপি থাকলেই হয় না মুসলমান,
নামাজ পড়লেই হয় না নামাজি,
অনেক সময় হয়ে যায় এটাই
দোজখের চাবি!

সাহাবিরা আমাদের মাথার তাজ ও আকাশের নক্ষত্রতুল্য, কিন্তু তাদের কথা নয় যারা নবির বংশকে পদে পদে নির্যাতন করেছে।

খারেজিদের চেহারা

এরাই খারেজি।
খারেজি মানে কী জানো?
খারেজি হলো দলত্যাগী।
কার দল ত্যাগ করেছিল তারা?

ইতিহাস খুলে দেখ তোমরা
দুমাতুল জন্দলের রায়কে অমান্য করে
আলির পক্ষ ত্যাগ করে
বার হাজার সৈন্য মিলিত হয়
হারুরা নামক প্রান্তরে
নেতা তাদের নির্বাচন করে
আবদুল্লাহ বিন ওহাবকে।
আলিকে ত্যাগ করে বলে :
লা হুকমা ইল্লাহ বিল্লাহ॥
এরাই খারেজি।

আলি আছে সত্যের মাঝে,
সত্য আছে আলির মাঝে॥
তা কী দিয়ে বুঝানো যাবে?
আলি যে দিকে যায়
সত্য সে দিকে যায়
মহানবির তা ফরমান,
সেই সত্যকে ছেড়ে দিলে
মিথ্যা ছাড়া কী পাওয়া যায়?
খারেজিরা তো সেই সত্যকে ছেড়ে
মিথ্যাকে বুকে নিয়েছিল,
খারেজিরা সত্যের মাঝে হলে
আলি মিথ্যার মাঝে পড়ে যায়,
তা হলে যে নবির বাণী মিথ্যা হয়ে যায়
তা কী করে সম্ভব।
সম্ভব বলে মেনে নেয় যারা
এরাই খারেজি।

এরাই নাহ্ওয়ানের প্রান্তরে
শিবির স্থাপন করে আন্দোলনের তরে
আলি সংবাদ পেয়ে তাদের ঘোলা পানি
খাইয়ে ছাড়ে নাহ্ওয়ানের প্রান্তরে
তারপরও যত ঝামেলা করেছে
যারা এই দুনিয়া জুড়ে
এরাই খারেজি।
এরাই আলিকে ইসলামের শান্তি
বিনষ্টকারী বলে, হত্যার ষড়যন্ত্র চালায়
অবশেষে তারাই খারেজি সম্প্রদায়ের
আবদুর রহমান ইবনে মুলযাজকে দিয়ে
কুফার মসজিদে নামাজরত অবস্থায়
শহিদ করেছে আলিকে
হত্যা করেছে সত্যকে
এরাই খারেজি।
এরাই হাদিস জালকারী
যখন খুশি যেভাবে খুশি

হাদিস বানাতো তারা
প্রথম হাদিস জালকারী ছিল
ইবনে লাহ্ইয়া নামে পরিচিত
লাহ্ইয়া ছিল খারেজি দলভুক্ত
কিতাবুল মওজুয়াত গ্রন্থে প্রমাণিত
বিশ্বের ভেজাল হাদিসের জন্য দায়ী যারা
খারেজি নামেই পরিচিত তারা
এরাই খারেজি।
মুসলিম জাহানে কম বিশৃঙ্খলা
সৃষ্টি করে নি তারা
উমাইয়া আমলে বিশৃঙ্খলা করেছে
লাঠিপেটাও খেয়েছে
আব্বাসি আমলেও করেছে
লাঠিপেটাও খেয়েছে
পেটা খাইতে খাইতে পালিয়ে
মিশরে আসতে বাধ্য হয়েছে
মিশরে এসেও মরেছে
ফাতেমীয়দের হাতে
রাজনীতি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে
বিপদে পড়ে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়েছে
এরাই খারেজি।
আজ সত্যের দাওয়াত দেয় তারা
সত্যকে হত্যা করে,
আজ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তারা
ইসলামকে বিভক্ত করে,
আজ মানুষকে রং-বেরংয়ের
হাদিস শোনায় তারা
অর্থাৎ তাদের মাঝেই বর্তমানে
ভেজাল হাদিসের কারখানা।
এরা আলি মানে নাই
আলি মানে না মাজার মানে না
মরদুদের পথই তাদের বেহেশত খানা
আমার কবিতার প্রাণে তাই দিয়েছি
ইতিহাসে যা পেয়েছি
গ্রহণ করবে তারা
তকদির যাদের খাড়া
গ্রহণ করবে না তারা
তকদির যাদের মরা
এরাই খারেজি!

কী করে সাহাবি বলি তাকে
কী করে সাহাবি বলি তাকে
যে করেছিল সিফ্ফিনের প্রান্তরে
হজরত আলি (আ.)-এর সাথে প্রতারণার খেলা!
বর্ষার অগ্রভাগে কুরআন ঝুলিয়ে

মানব কুরআনের সাথে করেছে বেইমানির খেলা।
যে আলি (আ.)-কে রসুল বলেছিল
আলি আমা হতে, আমি আলি হতে;
যে ভালবাসে আলিকে, সে বাসে আমাকে;
যে যুদ্ধ করে আলির সাথে, সে করে আমার সাথে।
মোয়াবিয়া যুদ্ধ তো করেছিল আলি (আ.)-এর সাথেই
না! না! এই যুদ্ধ আলি (আ.)-এর সাথে নয়
এই যুদ্ধ করেছিল স্বয়ং রসুলের সাথে
কী করে সাহাবি বলি তাকে!
যে করেছিল ইমাম হাসান (আ.)-এর সাথে চরম প্রতারণা
সারা আরব জাহানে সৃষ্টি করেছিল বিশৃঙ্খলা।
শান্তির জন্য ইমাম হাসান (আ.) সন্ধি করেছে তার সাথে
তবুও সে অশান্তি সৃষ্টি করেছে সবখানে।
সন্ধিতে লিখিত ছিল মোয়াবিয়া শায়িত হলে
হাসান থাকবে আবারও সেই মসনদে।
না থাকিলে হাসান এ ভুবনে
হোসাইন বসবে সেই মসনদে।
কিন্তু করেছিল সে কী?
করেছিল জুমার খুৎবায় আলি (আ.)-এর
বংশের উপর অভিশাপের প্রচলন।
বেইমানি করে জহর খাওয়ায়ে
ইমাম হাসান (আ.)-এর করেছে প্রাণনাশন।
এই তো সেই নিষ্ঠুর মোয়াবিয়া,
কী করে সাহাবি বলি তাকে।
সে মৃত্যুর আগে, সন্ধিভঙ্গ করে
মসনদে বসাইয়া গেছে কু-পুত্রজন।
হোসাইন (আ.) তা মেনে নেয় নি বলে
রক্তে লাল হয়েছে কারবালার প্রান্তর।
হোসাইন (আ.) শহিদ হয়েছে কারবালায়
বিশ্ব কেঁদেছে, কাঁদছে, কাঁদতে থাকবে
যতদিন থাকবে এ বিশ্ব ধরা।
কাঁদে নাই তারা যারা ছিল মোয়াবিয়ার গোলাম।
যাদের মাথায় টুপি ছিল, দাড়ি ছিল মুখে
পড়িত পাঁচওয়াক্ত নামাজ।
আজও কাঁদে না তারা হোসাইন (আ.)-এর জন্য
ফতোয়া মারে আজও মোয়াবিয়ার বংশরা
কাঁদিলে হোসাইন (আ.)-এর জন্য ফায়দা হবে না
রহমত থাকবে না ধরায়।
এরা তো তারই ফয়েজপ্রাপ্ত
কী করে সাহাবি বলি তাকে!
যার পিতা সুফিয়ান সারাটি জীবন
রসুলকে করেছিল পদে পদে জ্বালাতন
কালেমা পাঠ করেছিল মৃত্যু দেখেছে যখন।
যার মাতা হিন্দা, রসুলের প্রাণের চাচা
হামজার কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল।

সেই ডাইনির সন্তান ভালো হয় কোন গুণে।
আমি আমার মুর্শেদের কণ্ঠে
কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই॥
দোজখে যদি যেতে হয় যাব
তবু সাহাবির স্বীকৃতি কোন মুখে দেব?
ইমাম বংশের উপর এত নিষ্ঠুরতার পর
সাহাবির খাতায় নাম থাকে কী করে?
সাহাবি হলে আলে মুহাম্মদের উপর
নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার করে কী করে?
তাই আমি
কী করে সাহাবি বলি তাকে!